

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মজুমদার
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
বিষ্ণু দাশ
ড. হীরেন্দ্রনাথ তরফদার
ড. শিশির মল্লিক
শিখা দাস

সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৬-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

প্রীতিশঙ্কর সরকার

গৌরীঙ্গ লাল সরকার

কম্পিউটার কম্পোজ

পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা:) লি:

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছুর

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

উজ্জ্বল ঘোষ

ভিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রসঙ্গ-কথা

শিকা জাতীয় জীবনের সর্বোত্তমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিকাবীর অর্জনহিত মেধা ও সন্তানবীর পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিকাবীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য মণ্ডলিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় অদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিকাবীদের বরন, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিকাবীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবেধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্মাদবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অত্যন্তবৃহৎ প্রয়োগ ও বিভিন্নজাত বাংলাদেশের বৃক্ষকর্ম-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিকাবীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের ঐচ্ছিক পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিকাবীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিকাবীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুরে শিখনফল সূক্ত করে শিকাবীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইজিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও আনান প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে **হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা**। এ পাঠ্যপুস্তক তের প্রতিটি অধ্যায়ে ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ সরলভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি ধর্মীয় ধারণার জীবনচরণমুখী শিক্ষা এবং এর প্রায়োগিক দিক অঙ্গোচিত হয়েছে। ফলে এ পাঠ্যপুস্তক কটি অধ্যায়ের মাধ্যমে শিকাবীরা উপলব্ধি করতে পারবে, ধর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান শুধুমাত্র ধর্মালোক এবং অনুষ্ঠান আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি নৈতিক চরিত্র গঠন এবং সমাজের একজন নৈতিক ও মানবিক পুণসঙ্গনু ভালামানুষ গড়ে তোলার পথ নির্দেশকও।

একবিংশ শতকের অধিকার ও প্রত্যাজন ও প্রত্যাজনকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক কটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তক কটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মকাজের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তক কটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তক কটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও দ্রুতিমুগ্ন করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বাণীর ক্ষেত্রে অনুত্ব হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বসাননীতি।

পাঠ্যপুস্তক কটি রচনা, সম্পাদনা, ভিত্তাজন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তক কটি শিকাবীদের অনন্বিত পাঠ ও প্রত্যাজিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বরের স্বরূপ	১-৯
দ্বিতীয়	ধর্মগ্রন্থ	১০-২২
তৃতীয়	হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস	২৩-৩৪
চতুর্থ	নিত্যকর্ম ও যোগাসন	৩৫-৪৪
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা পার্বণ	৪৫-৫৫
ষষ্ঠ	ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা	৫৬-৬৬
সপ্তম	আদর্শ জীবনচরিত	৬৭-৮৭
অষ্টম	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ	৮৮-১০০

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ

কত বিচিত্র আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ! উপরে অনন্ত আকাশ, নিচে জীববল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত। আমাদের পৃথিবী অক্ষরত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরাপুর। যেমন — ঋতুচক্রের আবর্তন, দিন-রাত্রির পালাবদল, গ্রহগুণ্ডমের অঙ্গন কক্ষপথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আবর্তিত হওয়া প্রকৃতি। অনন্ত আকাশ চন্দ্র, সূর্যসহ অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র রয়েছে। এসকল গ্রহ, নক্ষত্র ও উপগ্রহসমূহ নির্দিষ্ট গতিপথে ঘুরছে। সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে না। সবকিছুই একটি গভীর ঐক্য ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে চলছে। এ সবকিছুর কারণ ঈশ্বর এবং সবকিছুর তিনিই নিয়ন্ত্রক। অন্যথায় এ-মহাবিশ্বের সবকিছু যথানিয়মে আবর্তিত হতো না।

ঈশ্বর এক ও অমিত্য। তিনি নিরাকার, শাস্ত বা নিস্ত, অবিনশ্বর।

এ-বিশ্ব যা কিছু ঘটে তার একটি কারণ আছে। এ-তারণেরও কারণ আছে। এ-মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করলে অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। সৃষ্টির প্রথম কারণকে যদি প্রবান সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে তিনিই ঈশ্বর, তিনিই সৃষ্টির প্রথম কারণ।



ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন তিনি ব্রহ্ম। আবার তিনিই ভগবান এবং জীবের মধ্যে আত্মরূপে তিনিই অবস্থান করেন। জাদী, হোদী ও ভক্ত নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করেন। চিন্তাশক্তি বা মোক্ষলাভের জন্য ভক্ত ঈশ্বরের কাছে ছুঁ তি করেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জ্ঞানেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে অনেক মন্ত্র ও প্রোক্ত রয়েছে। এ-অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এ-অধ্যায়-পেয়ে আমরা —

- ☐ ঈশ্বর এক ও অমিত্য — এ-ধরনটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও জীবাত্মা — এ-ধরনটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ জাদী, হোদী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ঈশ্বরের আত্মরূপে অবস্থান ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব

- ধর্মগ্রন্থ থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি প্রার্থনামূলক সংস্কৃত শ্লোক ও একটি বাংলা কবিতা অর্থসহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বরের অগুণ উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস সঞ্চালন করতে পারব।

পাঠ ১ : ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়

ঈশ্বর এক-বিশু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-র সকলকিছুর নিয়ন্ত্রক।

দেব-দেবীরা তাঁরই গুণ বা শক্তির প্রতিচ্ছবি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

মোতামুত্তর উপনিষদে ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

একো দেবঃ সর্বমুতেষু গুত্বঃ

সর্বব্যাপী সর্বস্বত্বস্বরাত্ত্বঃ।

কর্মাদ্যক্ষঃ সর্বমুত্থিবাং

মাকী তেতা কেবলো নির্গুণাচ।



সংলক্ষ্য : সেনানিদের ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং জীবের মধ্যে প্রাকল্পরূপে অবস্থান করছেন। তিনিই সর্বব্যাপী। সকল জীবের আত্মা, সকল কাজের কর্তা এবং সকল জীবের আবাসস্থল। তিনি সকল কিছু দেখেন, সকল জীবকে চেতনা দান করেন। তিনি নিরাকার ব্রহ্ম।

ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত করছেন। গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ এ-মহাকাশে নির্দিষ্ট গতিপথে অবর্তিত হচ্ছে। জীব ও জড়বস্তু সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। জীব জন্মশ্রমত করছে, আত্মশোষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেহত্যাগ করছে। হিন্দুধর্মদৃষ্টান্তে সেহের ধরনে আছে, কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস নেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন জীবের বৈচিত্র্যের মাঝে একটি শৃঙ্খলা বিরাট করছে। একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক না থাকলে এ-মহাবিশ্বের সকল কিছু শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত হতো না।

ধানধারণী ও মানুষের অভিজ্ঞতা হতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। পূর্বজন্মের অর্থই জ্ঞানার্জন, শক্তির সঞ্চয়। ধর্মিকতা ও সত্যজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করে, যার মাধ্যমে নৈতিক চিন্তাবোধ বিকশিত হয়। উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, ‘সূর্য তাকে প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্র, তারকা, বিন্দু, অগ্নিও তাকে প্রকাশ করতে পারে না, সর্বত্র তিনিই প্রকাশিত আছেন এবং সকল কিছুই তিনি প্রকাশ করেন।’ উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, প্রাণী ও অপ্রাণী যে-কোনো বিষয়ে বা পদার্থে যে-স্থান থেকে জন্মলাভ করে, মৃত্যু বা ধ্বংসের মাধ্যমে আবার যার কাছ থেকে ফিরে আসে, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ভালো কাজের ফল সুখ এবং মন্দ কাজের ফল অশুভ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি সবকিছু জানেন। তাই তিনি পুণ্যাত্মকে সুখী করেন, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেন এবং অশুভভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সবকিছুর একমাত্র নিয়ন্ত্রক।

একক কাজ : ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে শ্রোতৃশ্রুতর উপনিষদের স্তোত্রটি আবৃত্তি কর।

নতুন শব্দ : শাস্ত্রত, অবিনশ্বর, বিশুব্রজাও।

পাঠ ২ : ঈশ্বর, তগবান ও জীবাত্মা

ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম রয়েছে এবং আমরা তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকি। যেমন— ব্রহ্ম (পরমাত্মা), ঈশ্বর ও তগবান। ঋগ্বেদা ঈশ্বরকে ব্রহ্ম পরমাত্মা, ঈশ্বর, তগবান ও আত্মা (জীবাত্মা) - রূপে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা ঋগ্বেদের বর্ণনানুসারে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, তগবান ও জীবাত্মার পরিচয় জানব।



১. ব্রহ্ম

হিন্দুধর্ম অনুসারে বিশুব্রজাও ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সকল জীব ও বস্তু র প্রাণী। এ বিশুব্রজাও যা কিছু ঘটছে সবই তাঁর কারণ। নিরাকার ব্রহ্মকে বোঝাবার জন্য ঋগ্বেদে 'ওঁ'—এ প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃহৎ। বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম—বৃহৎ বলেই নাম তাঁর ব্রহ্ম এবং এ-ব্রহ্ম নিরাকার। আবার ব্রহ্মকে বলা হয়েছে, তিনি সত্য। অর্থ্যাৎ সত্যই ব্রহ্ম। কোনো কোনো ঋষি আবার বলেছেন, ব্রহ্ম আনন্দময়। আমাদের আনন্দ ব্রহ্মেরই আনন্দ। এই ব্রহ্মকেই আবার বলা হয় পরমাত্মা।

ঈশ্বর

ঈশ্বর শব্দের অর্থ প্রভু। অর্থ্যাৎ সকল জীবের সকল কাজের প্রভুত্বকারী। ব্রহ্ম যখন জীবের উপর প্রভুত্ব করেন এবং জীবকূলে সকল কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। নিরাকার ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে, নিজের আনন্দের জন্য নিজেকেই নানারূপে রূপায়িত করেন।

ঈশ্বরই অবতার। তিনি যখন দুষ্কের দমন করেন এবং ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসেন, তখন তাঁকে অবতার বলে। যেমন—যক্ষা, কূর্ম, বরাহ, বামন, রাম প্রভৃতি।

আবার ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন—শক্তির দেবী দুর্গা, বিদ্যার দেবী সরস্বতী ইত্যাদি।

একথা সত্য যে, ঈশ্বর বহু নয়। অবতার বা দেব-দেবী ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ। সবই এক ঈশ্বরের দীপা।

তগবান

ঈশ্বরকে আমরা সর্বশক্তিমান হিসেবে প্রশংসা ও ভক্তি করি। সর্বশক্তিমান বা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক বলে আমরা তাঁকে সমীহ করি এবং ভালোবাসি। তাঁকে ঘিরে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসার জাল সৃষ্টি করি। ভালোবাসার অপর নাম মমতা বা মমতা; এই মমতার জালে সকল জীব আবদ্ধ। তবে আমাদের কোনোকিছুর অভাব ঘটবে বা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলে ঈশ্বর আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, উপলব্ধি করতে পারি এবং ভক্তি করি। ভক্তের নিকট ঈশ্বর তগবানরূপে অবিস্থ হয়ে থাকেন। ভক্তের কাছে তগবান সাকার, আনন্দময় ও সর্বশক্তিমান।

‘ভগ’ শব্দটির মানে হচ্ছে ঐশ্বর্য। এখানে ‘ভগ’ বলতে ঈশ্বরের ছয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে। এ-গুণগুলো হলো— ঐশ্বর্য, বীর্য, হাশ, ব্রী, জ্ঞান ও দৈবশক্তি। এই ছয়টি ভগ বা ঐশ্বর্য আছে বলে ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়। ভগবান ভক্তের ভাকে সীড়া দেন ও লীলা করেন। সুতরাং, ঈশ্বর স্বয়ং ভক্তদের কৃপা করেন, তাদের দুখে দুঃ করে তাদের মজা করেন তখন তাঁকে ভগবান বলা হয়।

আত্মা বা জীবাত্মা

ঈশ্বর বা প্রভুর আরেক নাম পরমাত্মা। এ-পরমাত্মা জীবের মধ্যে অবস্থান করেন বলেই জীবের চেতনশক্তি আছে। এই চেতনাই জীবাত্মা বা পরমাত্মা। এ-জীবাত্মা বা পরমাত্মার ক্ষণে নেই। কেবল দেহের ক্ষণে হয়। আর দেহের এ ক্ষণেকই বলা হয় মুহূর্ত।

বিশুবাবু কবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবের মধ্যে আত্মারূপে নিরাকার প্রাণ বা পরমাত্মার খ্রিস্টাশীল থাকার বিষয়টি চমৎকারভাবে তাঁর একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন :



সীমার মাঝে অসীম কৃমি
 রাজ্যে আপন সুর,
 আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
 তাই এত মধুর।

জীবের দেহের সীমার মধ্যে আত্মারূপে পরমাত্মা বিরাজ করেন। তাই জীবের মধ্যে ঈশ্বর খ্রিস্টাশীল বলেই জীবন এত সুন্দর, এত মধুর।

সুতরাং প্রকৃত ঈশ্বর, ভগবান এবং জীবাত্মা। ঈশ্বর এক এবং অমিত্যয়।

দলীয় কাজ : ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে লিখে একটি ভালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : কৃমি, ভগ, বৈরাগ্য, সর্বজ্ঞ।

পাঠ ৩ : জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর

জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত ঈশ্বরকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানী জ্ঞানের দৃষ্টিতে, যোগী যোগসাধনার মধ্য দিয়ে এবং ভক্ত ভক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।

ঈশ্বরকে যিনি জ্ঞানের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তিনিই জ্ঞানী। ধর্মগানন ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য গীতার বিভিন্ন পর্বেই কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরলাভের এসকল পথকে যোগসাধনা বলা হয় এবং যারা নিজেদের মধ্যে আত্মার উপাসনা করেন এবং যোগসাধনার সাথে সম্পৃক্ত হন তাঁদেরকে যোগীদ্বারা আখ্যায়িত করা হয়। আবার যারা ভক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেন তাঁরা হলেন ভক্ত। এখন জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের যে - স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তার আলোচনা করা হলো।

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর

যাঁরা সকল বিষয়বস্তু পরিভাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এবং আত্মাতেই সত্ত্বা ঐ থাকেন তাঁদের জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর প্রকাশ যিনি এ-মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তির মানুষের জন্ম, জীবনের জন্ম এবং ঈশ্বরের ভাষ্যসাধনা লাভের জন্ম কাজ করেন। জ্ঞান অর্থ জ্ঞানী, যোগ অর্থ যুক্ত হওয়া। জ্ঞানী শব্দের অর্থ তাঁড়ায় কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানীর সাথে যুক্ত হওয়া।

জ্ঞান দুই প্রকার-বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা আবার পরা ও অপরা হিসেবেও পরিচিত। বিদ্যাতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা হয়, আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি পায় যা থেকে সর্বমুখে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি, জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্য উদ্ভব এবং মুক্তির পথ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যায় জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হয় না এবং ব্রহ্ম বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তবে ধর্মশাস্ত্র অনুসারে জ্ঞানী বলতে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বোঝানো হয়।

যোগীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর

যাঁরা একপ্রকার সহকারে মনের অন্তর্ভুক্ত থেকে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন, সকল কামনা-বাসনা দূর করে স্নিহে চেষ্টা করেন তাঁদেরকে যোগী বলা হয়। তাঁদের কাছে ঈশ্বরকে লাভ করা মুখ্য কাজ।

যোগীদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অদৃশ্যমান করেন। তাই যোগীর কাছে জীবও ঈশ্বর। মহাযোগী ও জ্ঞানী শ্রীমদ্বিবেকানন্দ এ-মহাবিশ্বের সকল কিছুই বহুব্রূপে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন এবং তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর অমর বাণী প্রচার করেছেন— ‘জীবো ব্রহ্ম করে সেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।’ অর্থাৎ জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।



ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর

যাঁরা সহস্রাবারো বিষয় ও বৈয়মিক কর্মের মধ্য থেকে সর্বশ্রুতিমান ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদের ভক্ত বলা হয়। ভক্তেরা সর্বজীবের ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং সেভাবেই জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করে থাকেন।

ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান। তিনি সাকার। তিনি রসময়, আনন্দময় ও গুণময়।



কখনও কখনও ভগবান ভক্তের সেবা করেন। ভক্তের বোঝা বহন করেন। ভক্তও ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। নিজের সকল কাজকে ভগবানের কাজ বলে সম্পাদন করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তের মনে নিবিড় ও গভীর ভালোবাসা বিরাজ করে। শূণ্ণ তা-ই নয়, তাঁর সৃষ্টিকেও যেন গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে সেজন্য ভক্ত তাঁর নিকট বিভিন্ন সময় প্রার্থনা করেন।

দত্তদ শব্দ : সমর্পণ, আত্মত্যাগ, বিষম্বাসনা, রসময়, মহামোহী।

পাঠ ৪ : প্রার্থনামূলক মন্ত্র ও বাংলা কবিতা

ক. প্রার্থনামূলক মন্ত্র

দূতে দুহে মা মিত্রস্য চক্ষুসা
সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষস্বাম্
মিত্রস্যহং চতুষা সর্বাণি লুতানি সমীক্ষে ।
মিত্রস্য চক্ষুস্য সমীক্ষামহে ॥

(শুক্ল যজুর্বেদ, ৩৬.১৮)

সরলার্থ : হে ঈশ্বর, আমাদের এমন দূত কর যেন সকল প্রাণী আমাদের কষ্টের কাছে দেখে। আমিও যেন তাদের কষ্টের কাছে দেখি। আমরা সকলেই যেন পরস্পরকে কষ্টের কাছে দেখি।

ব্যাখ্যা :

শুক্ল যজুর্বেদের এ-মন্ত্রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, ঈশ্বর যেন আমাদের জ্ঞানে, শক্তিতে এমন দূত করেন, যেন সকল প্রাণী আমাদের সঙ্গে কষ্টের মতো আচরণ করে। আমরাও যেন সকলের সঙ্গে কষ্টের মতো আচরণ করি।

কাউকে যেন হিংসা না করি। এভাবে আমরা সকলেই যেন সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করি। তার ফলে জীবন হবে শান্তিময়। বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক—এ প্রার্থনা মন্ত্রটির মধ্য দিয়ে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

খ. পার্বনামূলক বাংলা কবিতা

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে—
নির্মলগ করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে।
জাগ্রত করো, উন্নত করো, নির্ভয় করো হে।
মজল করো, নিয়ন্ত্রণ নিঃসংশয় করো হে।
মুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্দ।
সমগ্র করো সকল কর্মে শান্ত তোমার হৃদয়।
চরণগদে মম চিত্ত, নিশ্পদিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে।

(গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ব্যাখ্যা : ঈশ্বরের কাছে পবিত্র, উদার ও সুন্দর মন এবং সচেতনতা, সক্রিয়তা ও নির্ভীকতা প্রার্থনা করা হয়েছে। ঈশ্বর যেন আমাদের ঐক্যবান্দ করেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যেমন শৃঙ্খলা রয়েছে, আমাদের সকল কাজে যেন থাকে সেই শৃঙ্খলা। আমরা যেন নির্ভয় ও নিঃসংশয়ে সকল কাজ করতে পারি এবং সকলের তথা বিশ্বে সকল প্রাণীর মজলসাহন করতে পারি। সকল বাধাবিঘ্ন হিন্ম করে আমরা সকল মজল ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারি। সবশেষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, যেন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় তত্ত্ব থাকে। ঈশ্বর যেন আমাদের মজল করেন এবং আনন্দে রাখেন।

টীকা

যজুর্বেদ : হিন্দুধর্মের একটি মৌলিক গ্রন্থ। এতেও ঋগ্বেদের মতো দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছুঁতি ও পার্বনামূলক মন্ত্র রয়েছে। যজুর্বেদের দুটি অংশ—শুরু ও কৃষ্ণ। যজুর্বেদের প্রধান বর্ণনার বিষয় যজ্ঞ ও যজ্ঞপ্রণালী।

শ্রোতৃপুত্র উপনিষদ : বারোটি প্রধান উপনিষদের মধ্যে শ্রোতৃপুত্র উপনিষদ অন্যতম। এ-উপনিষদে আমরা কোথা থেকে জন্মেছি, কীভাবে জীবনধারণ করছি এবং প্রলয়ের পরে কোথায় থাকব এসকল বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এ-উপনিষদে প্রেমের হৃৎপদে বাধ্য করা হয়েছে।

একক কাল : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্বনামূলক কবিতাটির প্রত্যয় সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : নিঃসংশয়, নিশ্পদিত, সমগ্র, সক্রিয়তা, নির্ভীকতা।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

- এ বিশ্বসৃষ্টির প্রথম কারণ।
- ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ভালো কাজের ফলাফল।
- ঈশ্বর শব্দের অর্থ।
- ভক্তের নিকট ঈশ্বর।
- জ্ঞানীর কাছে লাভ করা মুখ্য কাজ।

মিলকরণ : ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর যখন নিরাকার	তিনি অশাস্ত্র
২. ব্রহ্ম সর্বত্র	ব্রহ্মেরই আনন্দ
৩. ব্রহ্মের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই	সর্বশক্তিময় সকল জীব ও বস্তু র স্রষ্টা
৪. আমাদের আনন্দ	ব্রহ্মারই সৃষ্টি
	তখন তিনি ব্রহ্ম

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ঈশ্বরকে এক ও অবিভীয়া বলা হয়েছে কেন ?
- আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কেন ?
- পরমাত্মা বলতে কী বোঝায় ?
- ঈশ্বর কখন ব্রহ্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ঈশ্বরকে ভগবান বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঈশ্বরের আদ্যোদ্যে অবস্থান ও স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
- ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
- পাঠ্যে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা প্রার্থনাটি লেখ এবং এর অর্থ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. যোগীর কাছে ঈশ্বর—

- | | |
|-------------|-------------|
| ক. ব্রহ্ম | খ. ভগবান |
| গ. পরমাত্মা | ঘ. পরমেশ্বর |

২. সকল জীবের মধ্যে চৈতন্যবোধ জাগ্রত করেন কে ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. ঈশ্বর | খ. ভগবান |
| গ. ব্রহ্ম | ঘ. পরমেশ্বর |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সজল তার কল্পদের কাছে বলেছে সে আর কোনো গণকাজ করবে না। সে চায় পৃথিবীতে যেমন তার জন্ম হয়েছিল নিম্মপভাবে তিক তেমনি বাকি জীবনটা পুণ্যার্জন করেই সুচরিত্র করতে।

৩. সজলের মধ্যে কোন গ্রন্থের জ্ঞান কাজ করেছে ?

- | | |
|---------------|-------------|
| ক. যজুর্বেদ | খ. অথর্ববেদ |
| গ. দেবতান্ত্র | ঘ. কঠোপনিষদ |

৪. সজলের উক্ত কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য —

- i. পরলৌকিক সুখ
- ii. ইহলৌকিক সুখ
- iii. জাগতিক সুখ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

কবিতা ও সবিতা দুই রোম। কবিতা ঈশ্বরকে জ্ঞানার জন্য প্রারণ পড়াশোনা করে। সংসারের কোনো কাজের প্রতি তার মনোযোগ নেই। তার চিন্তা শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে। অন্যদিকে সবিতা পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। সে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের পাশাপাশি বৃদ্ধা-পার্ববও করে, যাতে সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে।

১. যজুর্বেদের কয়টি অংশ ?

২. আমি বিবেকানন্দের ঈশ্বর-সম্বন্ধিত বাণীটি ব্যাখ্যা কর।

৩. সবিতা কোন বিদ্যা অধ্যয়ন করেছে? তোমার পঠিত 'জ্ঞানীর স্মৃতিতে ঈশ্বর'-এর অলোকে ব্যাখ্যা কর।

৪. শব্দ অনুযায়ী সবিতাকে জামি বলা যায় কি? তোমার পাঠ্যের অলোকে সূক্তি প্রদর্শন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ

যে-গ্রন্থে ধর্ম ও কল্যাণময় জীবনের কথা উল্লেখ থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, খ্রীষ্টীয়চর্চা প্রভৃতি আমাদের উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। বেদ আমাদের আদি ও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। বেদ চিরন্তন ও শাসুত। 'বেদ' মানে জ্ঞান। প্রাচীন ঋষিদের দ্বারা পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ-জ্ঞান হচ্ছে জগৎ-জীবন ও তার উৎস পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান। বেদকে কেন্দ্র করে রচিত ধর্মতত্ত্বিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয় বৈদিক সাহিত্য। অঙ্গ মহাভারতের অংশবিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংক্ষেপে গীতা হিসেবে পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। গীতার কর্মকে 'যজ্ঞ' বলা হয়েছে। এখানে রয়েছে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অঙ্গুর্ভব সমন্বয় এবং বাস্তব জীবনে চলার প্রয়োজনীয় নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশ।



এ-অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যের সর্জনস্ব পরিচিতি, চতুর্বেদের বিষয়বস্তু ও ধর্মচরণে তার প্রভাব এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণিত চতুর্বর্গ, কর্তব্যপালন, সাম্য, চরিত্র গঠনে মানবিক গুণাবলি এবং ভক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ-অধ্যায়শেষে আমরা –

- ☐ ☐ বৈদিক সাহিত্যের সর্জনস্ব পরিচয় দিতে পারব
- ☐ ☐ চতুর্বেদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে ও ধর্মচরণে তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- ☒ ☐ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে চতুর্বর্গ, কর্তব্যপালন, সাম্য, চরিত্রগঠনে মানবিক গুণাবলি ও ভক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ☐ জীবন ও ধর্মচরণে বেদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারব।

পাঠ ১ : বৈদিক সাহিত্যের পরিচিতি

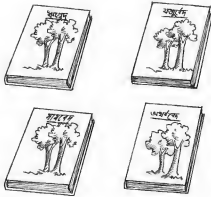
বেদ আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ। 'বেদ' মানে জ্ঞান। জ্ঞান অর্জনের অন্য প্রগাঢ় স্রষ্টা বা সাধনায় প্রয়োজন। জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিমগ্ন হতে হয় গভীর সাধনায়। গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়ারকে বলা হয় ধ্যান। যারা সত্তা বা জ্ঞান এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাহাত্ম্য দর্শন বা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাদেরকে বলা হতো ঋষি। বেদ এই ঋষিদের ধ্যান পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এবং জগৎ ও জীবনের উৎস পরমসুখ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান।

আমাদের জীবন, জীবনের উৎস, পরমসুখ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রকৃতি সম্পর্কে গৃহ্য সমূহের মধ্যে বেদ বা সাহিত্য, ব্রাহ্মণ, অরণ্যক, উপনিষদ ও বেদান্ত অন্যতম। এ-গৃহ্য সমূহ তিন ধরনের হলেও ধর্মীয় নাম দিক থেকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। এভাবেই বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর এ-ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয়েছে বৈদিক সাহিত্য।

বৈদিক সাহিত্যের অংশ হিসেবে যে-বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

চতুর্বেদ

বেদের এক নাম সাহিত্য। সাহিত্য মানে সংগ্রহ বা সংকলন। সমগ্র বেদ অর্থাৎ এ সাহিত্যগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা - ১. ঋগ্বেদ সাহিত্য ২. যজুর্বেদ সাহিত্য ৩. সামবেদ সাহিত্য এবং ৪. অথর্ববেদ সাহিত্য। আর এ সাহিত্যগুলোকে একত্রে বলা হয় চতুর্বেদ।



ব্রাহ্মণ

বেদের দ্বিতীয় অংশ। ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ। বেদের যে-অংশে ব্রহ্মের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন যজ্ঞ তাদের প্রয়োগ বা ব্যবহারের কথা আদ্যোচিত হয়েছে তাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়। ব্রাহ্মণগুলো গদ্যে রচিত।

ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু র মধ্যে রয়েছে বিবিধ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ, বেদমন্ত্রের অর্থ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, বিরোধী মতের সমালোচনা প্রকৃতি।

আরণ্যক

আরণ্যক এবং উপনিষদ প্রাচ্যের অংশ। প্রাচ্যে বেদের কর্মকাণ্ড আলোচিত আর আরণ্যক এবং উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড বিস্তৃত।

যা আরণ্যে রচিত তাকে আরণ্যক বলে। এখানে অরণ্য বলতে নির্জনতাকে বোঝানো হয়েছে। আরণ্যকের বিষয় ধর্মনির্দেশন। কার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, সৃষ্টির উৎস বা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। গভীর জ্ঞানকে আরণ্য বা গভীর বনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় যাতে বর্ণিত আছে তাই আরণ্যক। যেমন— ঐতরেয় আরণ্যক, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আরণ্যক।

উপনিষদ

আরণ্যকে যে-অধ্যাত্মবিদ্যার সৃজন, উপনিষদে তা আরও উচ্চতর ও গভীরতা লাভ করেছে। উপ- নিঃসদ + ক্লিপ = উপনিষদ।



এখানে 'উপ' অর্থ সহীসে বা নিকটে, 'নি' অর্থ নিশ্চয়, 'সদ' যাত্ত্ব অর্থ অবস্থান, প্রাণিত বা শিখিলীকরণ। অর্থাৎ গুরুর নিকটে বসে যে-জ্ঞান অর্জন করা হয় তাকে উপনিষদ বলে। কিন্তু এ-কথায় উপনিষদের বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয় না। জীবের মূলীভূত সত্তা হচ্ছে তার আত্মা। এই আত্মা পরমাত্মা বা প্রেমেরই অংশ। সুতরাং জীব প্রমা হওয়া আর কিছুই নয়। এই প্রশ্ন নিরাকার। কিন্তু জীবের আত্মাহুঁসে জীবের মধ্যে তাঁর অবস্থান। তিনিই সবকিছুর মূল। এই প্রশ্নজ্ঞান উপনিষদের বিষয়বস্তু।

প্ৰতীমিক উপনিষদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১২ খানা উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদ বলে খ্যাত। বাকিগুলো পরবর্তীকালের। মহাত্মারতের অন্তর্গত হয়েছে পৃথক গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত শ্রীমদভগবদগীতাকে উপনিষদের সার বলা হয়েছে। ঐতরেয়, কঠ, কেন, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ।

একক স্বাক্ষর : হকে প্রমত্ত প্রত্যেক প্রকার গ্রন্থ সম্পর্কে দুটি শব্দ স্থিখে যরগুলো পূরণ কর।	চতুর্বেদ	প্রাচ্য	আরণ্যক	উপনিষদ

বেদাঙ্গ

বেদ পাঠের সহায়ক হিসেবে আরও কয়েক রকমের রচনা রয়েছে। বেদপাঠের অঙ্গ বলে এগুলোকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ বেদপাঠের সহায়ক শাস্ত্র। বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকলে বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। বেদাঙ্গগুলি সূত্রাকারে রচিত। বেদাঙ্গ ছয় প্রকার। যথা— শিখা, কল্প, ব্যাকরণ, নিবৃত্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

১. **শিখা**— শিখা শব্দটি এখানে সাময়িকভাবে বিদ্যার্জন বা জ্ঞানার্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 'শিখা' বলতে বোঝানো হয়েছে ধনিতত্ত্ব, বিশেষ করে উচ্চারণতত্ত্ব নির্ভুলভাবে বৈদিক শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতি।
২. **কল্প**— যজ্ঞাদি যাত্র দ্বারা কল্পিত ও সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলা হয়। 'কল্প' হচ্ছে নির্ভুলভাবে বৈদিক যাপনয়জ্ঞ ও ক্রিয়াকাত অনুষ্ঠানের পদ্ধতি।
৩. **ব্যাকরণ**— ব্যাকরণে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে সন্মিলিত করা হয় এবং শব্দের স্থানপতি নির্ণয় করা হয়। তাহা ব্যবহারের সময় তার অর্থসুস্থির জন্য ব্যাকরণ পাঠ করা প্রয়োজন। সে-কারণে ব্যাকরণও একটি বেদাঙ্গ।
৪. **নিবৃত্ত**— নিবৃত্ত নামক বেদাঙ্গে বেদে ব্যবহৃত শব্দাবলির উৎপত্তি, অর্থ ও অর্থাত প্রভৃতির আলোচনা করা হয়েছে।
৫. **ছন্দ**— যজ্ঞ বেদাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে ছন্দ। বেদের যেসকল মন্ত্র ছন্দবদ্ধ সেগুলোর অর্থবোধ এবং যথাযথ আবৃত্তির জন্য ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য।
৬. **জ্যোতিষ**— বৈদিক যুগে বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে বিশেষ বিশেষ বৈদিক যজ্ঞ করার ব্যবস্থা ছিল। যজ্ঞে ফলসিদ্ধির জন্য জ্যোতিষের আবশ্যক।

একক কাল : বেদাঙ্গের ছয়টি অঙ্গের প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করে বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : চতুর্বেদ, কল্প, নিবৃত্ত, অর্থাত, ছন্দ, যজ্ঞাঙ্গ, জ্যোতিষ, ব্রাহ্মণ, অরণ্যক, উপনিষদ, ঐতরেয়, কঠ, জেন, হাদোণ্য, প্রগাঠ, নিমগ্ন, সংহিতা, নিবৃত্ত।

পাঠ ২ : চতুর্বেদের বিষয়বস্তু

বেদ ঈশ্বরের বাকী। ঋষি মনু বলেছেন- 'বেদঃ অবিলম্বমমূলম্' অর্থাৎ বেদ হচ্ছে সকল ধর্মের মূল। এখানে সত্য ও জ্ঞানের দানো বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ-সত্য বা জ্ঞান অস্তমুষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। বেদে বিভিন্নভাবে ঈশ্বর ও দেবতাদের স্তুতি বা প্রশংসা করা হয়েছে। ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে সেবতা বলে। অগ্নি, বৃষ্টি, বায়ু, উষা, রাত্রি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে ঈশ্বরের অসীম ক্রমতা উপলব্ধি করে বৈদিক ঋষিগণ তাঁদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের স্তুতি ও বন্দনা ঋষিদের কঠ থেকে কবিতার অকারে বাণীবৃন্দ পেয়েছে। গভীর ধ্যানে এই বাকী বা কবিতা ঈশ্বরের অঙ্গর অনুগ্রহে ধ্যানাঙ্ক ঋষিগণ ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন। তাই ঋষিরা বলেছেন, তাঁরা বেদ দর্শন করেছেন। এজন্য বেদকে বলা হয়েছে অঙ্গীতবেদ। অর্থাৎ বেদ কোনো পুরুষ বা ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়, তা ধ্যানে সৃষ্ট।

বেদের সত্তা সেবতাদের প্রসঙ্গ বৃত্ত। বেদের বিষয়কে বলা হয় সেবতা। বিভিন্ন স্তুতি বা স্তির মাধ্যমে ঋষিগণ সেবতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বৈদিকযুগে উপাসনার পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ বা হোমজৈতিক। তখনও মূর্তি বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে

উপাসনা করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি। ঋষিগণ দেবতাদের শক্তি স্বাক্ষর করে মন্ত্রের মাধ্যমে উপাসনা করতেন এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দেবতাকে আহ্বান করতেন।

ঋষিগণ বৈদিক দেবতাদের তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন।

যথা- ১. ঋগের দেবতা

২. অত্তরিকলোকের দেবতা

৩. পৃথিবীর বা মর্ত্যলোকের দেবতা।



ঋগের দেবতা : ঋগের দেবতাদের ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায়। এ-শ্রেণির দেবতারাই মর্ত্য বা পৃথিবীতে আসেন না। তাঁরা অনেক দূরে অবস্থান করেন। এমন দেবতা হলেন বিষ্ণু, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি।

অত্তরিকলোকের দেবতা : অত্তরিকলোকের দেবতাগণ স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের মাঝখানে অবস্থান করে না। তাঁরা মর্ত্যে আসেন, কিন্তু থাকেন না। এবুধ দেবতা হলেন ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ।

মর্ত্যলোকের দেবতা : মর্ত্যের দেবতাদের দেবা যায়। তাঁরা পৃথিবীতে অবস্থানও করেন। এমন দেবতা হলেন অগ্নি। অগ্নিকে মর্ত্যে পাওয়া যায় বলে তাকে পূজা করা হয় এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য দেবতাদের মর্ত্যে আহ্বান করে আনা হয়।

অগ্নি তালিকে বেদের বাক্য উচ্চারণ করে দেবতাকে আহ্বান জানানো এবং প্রার্থনা করাকে বলা হয় যজ্ঞ। যজ্ঞের সময় উচ্চারিত বেদের এই বাক্যকে কলা হয় মন্ত্র। এ ছাড়া রয়েছে গান। বেদের বাক্যে সুর আরোপ করে যজ্ঞের সময় গান গাওয়া হতো। এই গানকে বলা হয় সাম। সাম মানে গান। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রকার কলাও বেদে উল্লেখ আছে।

দলীয় কাজ : স্বর্গ, মর্ত্য ও অত্তরিকের দেব-দেবীর একটি তালিকা তৈরি কর।

প্রথমে বেদ অবিভক্ত আকারেই ছিল। পরবর্তীকালে মর্যবর্ষ কৃষ্ণাষ্টপাদ্যম বেদব্যাস বেদকে বিভক্ত করেন। তিনি বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন। এগুলোকে সাহিত্য বলা হয়। সাহিত্য মানে সংগ্রহ বা সংকলন। এ-সাহিত্যগুলো হচ্ছে —

১. ঋগবেদ সাহিত্য ২. যজুর্বেদ সাহিত্য ৩. সামবেদ সাহিত্য এবং ৪. অথর্ববেদ সাহিত্য। সাহিত্যগুলোর বিষয়বস্তু সহ সর্বাঙ্গীত পরিচয় দেওয়া হলো—

ঋগবেদ সাহিত্য

ঋক্ শব্দের অর্থ কুঁ তি। ঋক্গুলোকে মন্ত্রও বলা হয়। এই ঋক্ বা মন্ত্রগুলো হচ্ছে তিন বা চার পদবিশিষ্ট ছোট ছোট কবিতা। একসময়ে কবিতার মতো ঋগবেদের এই মন্ত্রগুলো আবৃত্তি করা হতো। সমস্ত ঋগবেদে এরকম ১০,৪৭২টি

ধক্ বা মন্ত্র রয়েছে। কয়েকটি মন্ত্রের সমন্বয়ে পঠন করা হয়েছে এক-একটি সূক্ত। সমস্ত ঋগ্বেদকে দশটি মণ্ডলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডলে কয়েকটি সূক্ত এবং প্রতিটি সূক্তে কয়েকটি ঋক্ রয়েছে। ঋগ্বেদে মোট ১,০২৮টি সূক্ত রয়েছে। সূক্তগুলোতে দেবতাদের কৃত্তি করা হয়েছে এবং তাদের কাছে সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইন্দ্র হচ্ছেন বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা। ইন্দ্রের প্রশংসা করে একটি ঋক্ বলা হয়েছে-

ইন্দ্রং ব্যং মহাবন
ইন্দ্রমর্জে হবামহে
যুগং বৃজ্জম্ বস্ত্রিপম্ ।

(ঋগ্বেদ-১ম মণ্ডল, ৭ম সূক্ত, ৫ম ঋক্)

ইন্দ্র আমাদের সহায়। শত্রুদের কাছে বজ্রধারী। আমরা অনেক সম্পদের জন্য কিংবা অন্ন সম্পদের জন্যও ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

এই মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্রকে নিজদের সহায় এবং শত্রুদের কাছে শাস্তি দানকারী বজ্র নামক অস্ত্র ধারী বলে কৃত্তি করা হয়েছে এবং তাঁর কাছে ধনসম্পদ প্রার্থনা করা হয়েছে। এই ঋক্ মন্ত্রটির দুটো হলেন ঋষি মধুচন্দা।

সামবেদ সংহিতা

সাম শব্দের অর্থ হচ্ছে গান। যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো ঋক্ বা মন্ত্র সুর করে গাওয়া হতো। এবুশ যেসকল মন্ত্র গান করে গাওয়া হতো তাকে বলা হতো সাম। যে-বেদে গীত ঋক্ বা মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয়েছে তাকে সামবেদ সংহিতা বলা হয়। সামবেদ থেকে প্রাচীনকালের সংগীত সম্পর্কে জানা যায়। আমরা যে সুর করে গান গাই, তার অধি উৎস এই সামবেদ। ষড়্জ, ঋষভ প্রভৃতি সমস্ত স্বরের (সরগাম) উৎসও সামবেদ। প্রোনিত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোকেই সুর দিয়ে গানের আকারে বৃণদান করা হয়েছে। সামবেদ সংহিতার মন্ত্রসংখ্যা হচ্ছে ১,৮১০ টি; এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকিগুলো ঋগ্বেদ থেকে গ্রহণ করে সুর দেওয়া হয়েছে।

যজুর্বেদ সংহিতা

যজুর্ মানে যজ্ঞের মন্ত্র। প্রাচীনকালের ঋষিরা বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে বা আবৃত্তি করে ধর্মযুগ্মান বা ঋণযজ্ঞ করতেন। যজ্ঞ করার সময় উল্লিখিত দেবতার সুনির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হয়। এভাবে যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করে যে-বেদ সংকলন করা হয়েছে তাকে যজুর্বেদ সংহিতা বলা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম পাল্যিত যজুর্বেদে সংকলিত হয়েছে। যজ্ঞকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু-সম্পর্কিত ধারণা। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞ করা হতো। কোনো যজ্ঞ ছিল ঈশানিন, কোনো যজ্ঞ ছিল সপ্তাহব্যাপী, কোনো যজ্ঞ ছিল পক্ষকালব্যাপী। আবার কোনো যজ্ঞ বর্ষব্যাপী, এমনকি দ্বাদশবর্ষব্যাপীও অনুষ্ঠিত হতো। একেক প্রকার যজ্ঞের জন্য একেক প্রকার বেদি নির্মাণ করা হতো। এই নির্মাণকৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উৎস ঘটেছে।

ঋগ্বেদ ও সামবেদ পদো রচিত। কিন্তু যজুর্বেদে পদা ও পদা উভয় রীতিই ব্যবহৃত হয়েছে। যজুর্বেদ দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। যথা- ১. কৃক যজুর্বেদ ২. শূক্ল যজুর্বেদ। কৃক যজুর্বেদের অপর নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। শূক্ল যজুর্বেদের অপর

নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদে ৭টি কাত ও ২১৮৪টি মন্ত্র রয়েছে। আর শূর্য যজুর্বেদে রয়েছে ৪০টি অধ্যায় এবং ১,৯১৫টি মন্ত্র।

অথর্ববেদ সংহিতা

বেদের চতুর্থ ভাগ হচ্ছে অথর্ববেদ। অথর্ববেদ সংহিতা অধ্যাত্মিক ও জগতিক নানাপ্রকার জ্ঞানের সংগ্রহ। অথর্ববেদের প্রাচীন নাম অথর্বজিগিস। অথর্ব বলতে ভেষজবিদ্যা, শাস্তি, পুষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞলক্ষিত্য বোঝায়। অজিগিস বলতে শত্রুবধ এবং বশীভূত করার উপায়, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বোঝায়। প্রাচীনকালের চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি পরিচায়ক হিসাবে অথর্ববেদ বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। অথর্ববেদে নানাপ্রকার ব্যাধির প্রতিকারের উপায়সমূহ নানাপ্রকার যুক্ত, লতা, গুল্ম প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অযুর্বেদ নামে পরিচিত চিকিৎসাশাস্ত্রে রূপে আদি উৎস এই অথর্ববেদ। এ ছাড়া এই বেদে অশ্বিনবিদ্যা ও শল্যবিদ্যার (সার্জারি) উল্লেখ আছে।

অথর্ববেদ সংহিতা কৃষ্ণি কাত, ৭৩১টি সূক্ত এবং প্রায় ৬,০০০ মন্ত্র নিয়ে গঠিত। অথর্ববেদ গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতে রচিত। পদ্যই বেশি। হয় ভাষার এক ভাগ গদ্যে রচিত।

একক কাজ : ছকে প্রদত্ত প্রত্যেক প্রকার বেদের দুটি করে বিষয়বস্তু চিহ্নিত কর	ঋগ্বেদ	সামবেদ	যজুর্বেদ	অথর্ববেদ

নতুন শব্দ : অন্তর্দৃষ্টি, অন্তরিক্ষলোক, সূক্ত, শল্য, অথর্বজিগিস, যজ্ঞ, ঋষভ।

পাঠ ৩ : ধর্মচরণে চতুর্বেদের প্রভাব

বেদ হিন্দুদের অদি ধর্মগ্রন্থ। এই বেদ একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়। বিপুলসংখ্যক গ্রন্থের এক বিশাল ভাণ্ডার। হিন্দু ধর্মের মূলগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। সৈনিক থেকে বৈদিক সাহিত্যের গুরুত্বও অসীম। এ ছাড়া প্রাচীনকালে ভরতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাসের পরিচয় পেতে হলেও বৈদিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সাহিত্য হিসেবেও বৈদিক সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদে দেবতাদের প্রশংসা করা, যজুর্বেদে যজ্ঞের বিষয়বস্তু সহ সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

বেদ পাঠ করলে শ্রুতি, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। প্রত্যেকটি বেদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঋগ্বেদে সাহিত্য পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন বৈদিক দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে পারি। অগ্নি, ইন্দ্র, উষা, রাত্রি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁদের কর্মচারণাকে আদর্শ করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

যজুর্বেদ যজ্ঞের মন্ত্রের সংগ্রহ। এ থেকে জানতে পারি সেকালে উপাসনালক্ষণটি কেমন ছিল। যজুর্বেদ অনুসরণে বিভিন্ন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষাঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কে ধারণা জন্মে। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করা হতো। যজ্ঞের বেদি নির্মাণের কৌশল থেকেই জাতিমিত বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে।

সামবেদ থেকে সেকালের গান ও রীতি সম্পর্কে জানতে পারি। ভগবতের সমস্ত গানের আধার এবং উৎস সামবেদ। আর এ-গান অর্থাৎ সামবেদ আমাদের মননশীলতাকে বাড়িয়ে দেয়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

অর্ধবৈদ সাহিত্যের ইঙ্গরাজ, বামি নিরাময়, অসাবুজি গ্রন্থ, চেম্বলবিদ্যা, শক্তি ও নাসামিধ শূভকর্মসংক্রান্ত মন্ত্রাদি ও নির্দেশনা রয়েছে। জীবনকে সুন্দর, সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে চেম্বলবিদ্যা অত্যন্ত পুরনুত্বের। রাই চেম্বল তাই অনুত। আর যা অনুত তাই ব্রহ্ম। এই অর্ধবৈদ হচ্ছে জ্যোবৈদ বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল। এখানে নামপ্রকার বোঝাবাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায়সমূহ নানাবৈদ্যের লতা, গুল্ম, বৃক্ষাদির বর্ণনা করা হয়েছে।

হুতোর সমগ্র বেদপাঠে পবনাত্মা, বৈদিক দেবদেবী, হজ্জ, সজীও, চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে জীবনকে সুস্থ, সুস্থ ও পবিত্র করে ওঠা যায়। আর এজন্যই এ-গ্রন্থ অমাদেব প্রত্যেকের পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য।

একক কাজ : হেদের শিক্ষা ভূমি কীভাবে জীবনচরণে প্রয়োগ করবে।

নতুন শব্দ : কর্মচামজা, বর্ষপঞ্জি, অঙ্গু, গুহা।

পাঠ ৪ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিজ্ঞানসত্ত্ব

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অঙ্ক ৩০ ২৫ থেকে ৪২ এই অষ্টাষোটি অধ্যায় একত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংক্ষেপে গীতা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে সর্বমোট সাতশত শ্লোক আছে। এজন্য এক অব এক নাম সত্ত্বশতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হেসব কথা বলেছেন তাই নাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সংক্ষেপে গীতা। যুগান্ধ্র ও পাণ্ডু-বুই ভাই। যুগান্ধ্র বড়, পাণ্ডু ছোট। কুরুবংশের নাম অনুসারে যুগান্ধ্রের সন্তানদের বলা হয় দৌবব। কিন্তু একই বংশ হয়েও পাণ্ডুর নাম অনুসারে তার সন্তানদের বলা হয় পাণ্ডব। রাজ্য নিয়ে এই কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ দেখে যায়। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বর্ষের সাক্ষি হয়েছিলেন। বর্ষ হখন দুপক্ষেই সৈন্যদের হাফখাসে রাখা হলে তখন অর্জুন স্বপক্ষ এবং বিপক্ষের দ্বন্দ্বিত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যুদ্ধে পড়লেন। অতি দিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দেন। সেই উপদেশপানাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণিত হয়েছে। উপলক্ষ অর্জুন হলেও গীতার ভগবান যে- উপদেশ দিয়েছেন, তা সকল কালেন সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। গীতা সকল উপদিশদের মূলতন্ত্র অঙ্গলখন বচিও- জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিরোগের এক অঙ্গু সমগ্র। কেনল কর্মজ্ঞানদুগেই নয়, দার্শনিক কাব্যগ্রন্থরূপেও গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গীতা নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ।



একক কাজ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিজ্ঞানসত্ত্ব দেখ।

নতুন শব্দ : কৌরব, পাণ্ডু।

পাঠ ৫ : শ্রীমদভগবদ্গীতায় চতুর্বর্ণ, কর্তব্যপালন, সাম্য ও ভক্তি

চতুর্বর্ণ

ভগবান মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন। তার পরও গুণ ও কর্মানুযায়ী তাঁর সৃষ্টিতে সমাজে চারটি বর্ণ বিভাগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মজনে বৃদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, যিনি সত্ত্ব গুণ দ্বারা প্রভাবিত। শাসক কিংবা মুখ্যকারী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন ক্ষত্রিয়, তিনি রজঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন বৈশ্য, যিনি রজঃ ও তমঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন শূদ্র, তিনি তমঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। এই যে বর্ণবিভাজন, এটি কিছু জন্মভেদ নয়, কর্মভেদে। যে যেরকম কাজ করে থাকে তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। এ-প্রসঙ্গে শ্রীমদভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— চতুর্বর্ণং মজ্জা সূক্ষ্মং গুণকর্মবিভাগশঃ, অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। ব্রাহ্মণের সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ হবে এমনটি নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ হতে পারেন। আবার কোনো ব্রাহ্মণের সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবে। সুতরাং বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মভিত্তিক।

কর্তব্যপালন

যা কিছু করা হয় তা-ই কর্ম। আর যেসকল কর্ম করা আবশ্যক তা-ই কর্তব্য। শ্রীমদভগবদ্গীতায় কর্তব্যপালনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর এ-কর্তব্যপালন করতে হবে নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কোনপ্রকার ফলের আশা না করে কর্তব্যপালন করা।

এ-প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

‘কর্মে তব অধিকার কর্মফলে নয়,
ফল আশা ত্যাগ কর, কর্ম যেন রয়।’— গীতা, ২/৪৭

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, ‘কর্ম অর্থাৎ কর্তব্যপালনই ধর্ম। তুমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং মাঠে যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। অসক্রিয়তাবোধে যুদ্ধ কর, একটি সুফল পাবে। তুমি যুদ্ধ না করলে তোমার ধর্ম নষ্ট হবে। কেননা স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে কর্ম সম্পাদন করাই ধর্ম।’

সুতরাং আমরা যে যেই অবস্থানে অছি, সেকাজুগুণে সঠিকভাবে সম্পাদন করাই আমাদের প্রকৃত ধর্ম। যেমন— ‘ছাত্রাণি অধ্যয়নং তপাঃ ছাত্রদের একমাত্র কর্তব্য অধ্যয়ন করা।

সাম্য

সাম্য বা সমত্ব মানে সমান। সকলকে সমান দেখার নাম সাম্যচেতনা। সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর সমানভাবে বিরাজমান। সুতরাং সকল জীবকে এই যে সমতার দৃষ্টিতে দেখা এবং সমতাপূর্ণ আচরণ করা এরই নাম সাম্যবোধ। শ্রীমদভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, সর্ববিদ্যায়ে সকলের প্রতি বীর আচরণ সমতাপূর্ণ, তিনিই শ্রেষ্ঠ (৬/৯)। শ্রীমদভগবদ্গীতায় আরও বলা হয়েছে, সমদর্শী সর্বদ্রুতে আহ্বাতকে সেক্ষেপ এবং আহ্বাত সর্বদ্রুতকে সেক্ষেপ (৬/২৯)। এর অর্থ হলো, যিনি সমদর্শী তিনি সকল জীবকে নিজের মতো মনে করেন এবং নিজেকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। সুতরাং আমরাও সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখব। শ্রীমদভগবদ্গীতায় থেকে আমরা সাম্য সম্পর্কে এ- শিক্ষা পাই।

ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলা হয়। ভক্ত ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাই বলা হয় ভক্তি হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মিলন সত্ত্ব।

শ্রীমদভগবদ্গীতার বলা হয়েছে ভক্ত কামনা-বাসনা মুক্ত হবেন। তাঁর সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করবেন। যিনি এভাবে ভগবানে আত্মনিবেদন করেন, তাঁর অন্তরে ভক্তি জন্মে এবং তত্ত্বজ্ঞেয়ই মুক্তি।

একক কাজ : কর্ম, সাম্য ও ভক্তির সম্পর্কে শ্রীমদভগবদ্গীতার শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : সত্ত্বা, রজঃ, তমঃ, ক্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আসক্তি, উপা, সাম্য, সমদর্শন।

পাঠ ৬ : জীবনাচরণে শ্রীমদভগবদ্গীতার শিক্ষা

গীতা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়। কারণ সূর্য ভগবানই যুগেযুগে দুইটির সমন, শিষ্যের পালন এবং ধর্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতরণে নেমে আসেন।

তিনি বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্রাসিত্বভি ভারত।
অতুস্থানমধর্মস্য তদাহানং সৃজামহম্।
পরিহ্রাণায় সাধুন্যং বিনাশায় চ দৃশকৃত্যম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। গীতা- ৪/৭-৮

অর্থাৎ যখনই ধর্মের অংশগতন এবং অর্ধের উদ্ভব হয়, তখনই সাধুদের পরিহ্রাণ, দুষ্কলোকদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।

অত্ভারৎ ধ্বংস নেই। — গীতার এই শিক্ষা আমাদের সুত্বকে ভয় না করে ভালো কাজে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়।

গীতায় বলা হয়েছে— ১. শ্রম্ভাবান ও সংযমী জননাতে সমর্থ হয় ২. অন্যাসক্ত কর্মযোগী মোক লাভ করেন ও. জ্ঞানীভক্তই তাঁকে ছুদরে অনুভব করেন এবং ৪. এই বিশাল বিশ্বে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান।

গীতার এই কথা থেকে আমরা শ্রম্ভ ও সংযম সাধনার দিকে মনোনিবেশ করি। জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্মম হওয়ার প্রেরণা পাই। ধর্ম অনুশীলনের কাজে প্রবৃত্ত হই অর্থাৎ অর্থহীন গতদুর্গতিক পথ পরিহার করে তত্ত্বের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করি। সবকিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জণত সকল ভেদবুদ্ধি দূর করে দিয়ে আমরা অন্যকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। যে বেভাবে বা যে-পথে ঈশ্বরকে ভাকতে চায়, ঈশ্বর সেভাবেই তার ভাকে সাড়া দেন। এখানেই বেজে ওঠে ধর্মসম্বন্ধের দূর।

গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করা হয়েছে। জ্ঞানের অংশকে মনকে আশে-কিত করতে হবে। তার জন্য কর্ম করতে হবে। এ-কর্ম হবে নিষ্কাম। আর সমস্ত নিষ্কাম কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করতে হবে। একেই বলে তত্ত্ব। এ-তিনের সমন্বয়ে জীবনপথে চলতে হবে। সুতরাং গীতায় বাস্তব জীবনে কীভাবে চলতে হবে সেই পথও সেখানে রয়েছে। সামগ্রিক বিচারে আমাদের জীবনাচরণে অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে শ্রীমদভগবদ্গীতার গুরুত্ব অপরিণীম।

একক কাজ : শ্রীমদভগবদ্গীতার শিক্ষা উপলব্ধি করে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : অতুস্থান, শ্রম্ভাবান, সংযমী, অন্যাসক্ত, কর্মযোগী, মোক।

অনুশীলনী

মূল্যস্থান পূরণ কর :

১. বেদ ঋষিদের পাওয়া পবিত্র জ্ঞান ।
২. সকল উপনিষদের সার ।
৩. সংহীতের অন্যতম অদি উৎস ।
৪. মর্ত্যলোকের দেবতা হলেন ।
৫. যজ্ঞাশ্রমের নিয়ম পদ্ধতি সংকলিত ।
৬. অথর্ববেদের প্রাচীন নাম ।

তাল পাশ থেকে শব্দ বা ব্যাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক	চতুর্বেদ
২. বেদাঙ্কের জ্ঞান না থাকলে	ঊমি পরিমাপ বিন্যাস উদ্ভব ঘটেছে
৩. সংহিতাপুত্রকে একবত্র বলা হয়	গুণ ও কর্মগত
৪. যজ্ঞের বেদি নির্মাণকৌশল থেকেই	সংকলন
৫. জাতি বা বর্ণভেদ সংশ্লিষ্ট নহে	বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না
	এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায় ?
২. বেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর ।
৩. সংহিতাচর্চায় সামবেদ সংহিতার ঊমিকা ব্যাখ্যা কর ।
৪. যজুর্বেদ থেকে কীভাবে বর্ণভিত্তি ও ঊমি পরিমাপ সম্পর্কে জানা যায় ?
৫. চতুর্বেদ সম্পর্কে শ্রীমদভগবদ্গীতার শিক্ষা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. 'বেদ অধ্যয়নে বেদাঙ্কের গুরুত্ব অপরিসীম'—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর ।
২. ঋগ্বেদে সংহিতার বিষয়বস্তু উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।
৩. 'আমাদের প্রত্যেকের চতুর্বেদ পাঠ করা আবশ্যিক' — উক্তিটি মূল্যায়ন কর ।
৪. 'জ্ঞান, কর্ম ও তত্ত্ববিশোধের এক অপূর্ব সময় হচ্ছে শ্রীমদভগবদ্গীতা' — বিশ্লেষণ কর ।

৫. সময় ও ভক্তি সম্পর্কে শ্রীমদভগবদ্গীতার শিখা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৬. আমাদের জীবনচরণে শ্রীমদভগবদ্গীতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সংহিতা মানে -

ক. গান

খ. কাজ

গ. সংগ্রহ

ঘ. সমীপে

২. বেদান্তের অন্যতম অঙ্গ কোনটি ?

ক. কল্প

খ. চন্দ

গ. শিক্ষা

ঘ. নিরুক্ত

৩. ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ দেবতারা পৃথিবীতে -

i. আসেন না

ii. অবস্থান করেন

iii. আসেন কিন্তু থাকেন না

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সীমা সীমহীন হাবাং বাতের ব্যাধ্য তুপছিল। অনেক চিকিৎসার পরও উপশম হচ্ছে না বিধায় সে ভাগতপুর গ্রামের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক জিতেনবাবুর শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় ছয় মাস চিকিৎসার পর সীমা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

জিতেনবাবুর চিকিৎসাপদ্ধতি কোন বেদের অন্তর্গত ?

ক. ঋগবেদ

খ. সামবেদ

গ. যজুর্বেদ

ঘ. অথর্ববেদ

খর্ব ও জীবনচরণে উক্ত বেদের ভূমিকা হচ্ছে -

i. অনাবৃষ্টি রোধ

ii. ব্যাধি নিরাময়

iii. শান্তি ও শূভকর্মের মঙ্গলদির নির্দেশনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

পুলিনবাবু অত্যন্ত নীতিবান ও ধার্মিক মানুষ। তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে লালনপালন করছেন। তবে ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে সুখে রাখবে এরূপ প্রত্যাশা তাঁর নেই। তিনি অনুভব করেন এ-সংসারের নিরর্থকভাবে দায়িত্ব পালন করাই প্রকৃত ধর্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও তিনি নিজের সন্তানের মতোই গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীরাও তাঁকে পিতৃকুল্য গভীর শ্রদ্ধা করে।

ক. গভীর সংসার নিমগ্ন হওয়ার কী বলে ?

খ. বেনকে কেন অশৌর্য্যেয় বলা হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

গ. পুলিনবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোন শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর পুলিনবাবুর পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস

সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর সঙ্গে মন প্রত্যয় যুক্ত করে ধর্ম শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ বা ধারণা ক্রিয়াকর্মণ, সেটিই ধর্ম। হিসো না করা, চুরি না করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, সেইমনে পবিত্র থাকা এবং সংযমী হওয়া—এ-পাঁচটি গুণ নিয়ে হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ। আবার ধর্ম-অর্থ নির্ণয়ে পবিত্র বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সম্বন্ধিত্বের আচার-আচরণ এবং বিবেকের নির্দেশ এই চারটি হচ্ছে হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ। বহু যুগের বহু সাধকের সাধনার ফলস্বরূপ নিয়ে এ-ধর্ম প্রকাশ বিকশিত হচ্ছে। হিন্দুধর্ম বহুকালের ধর্ম। চলার পথে মাঝে মাঝে নতুন ধর্মীয় চিন্তা এতে প্রবেশ করেছে। এ-ধর্মের বিধিবিধান অনুশীলন করে জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করা যায়।



সমাজজীবনে কর্ম বা জীবিকা অনুসারে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এ-চতুর্ভেদে সৃষ্টি হয়। এ-বর্ণভেদ ছিল পেশাগত, জন্মগত নয়। মনুষ্যের পূর্ণজন্ম জীবনকাল ধরা হয় শতবর্ষ। সমস্ত সময়টিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়— ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। একে বলা হয় চতুর্ভুজ।

হিন্দুধর্ম যুগবিভাগ রয়েছে- সত্তা, ত্রেতা, সাপ্তা ও কলি। প্রতিটি যুগের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মকর্মের কথা রয়েছে- সেগুলো যুগধর্ম। পবিত্র মেহমান নিয়ে ধর্মচর্চা করতে হয়। এজন্য পূজা, উপবাস, প্রার্থনা, উপাসনা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের অনুশীলন করতে হয়। হিন্দুধর্মে ব্রতপালনের ব্যবস্থা রয়েছে। ভক্তগণ ব্রতপালন করে পাপমুক্ত হয়ে থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পূজা, পার্বণ ও ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে ধর্মের সুফল পাওয়া যায়।

আমরা এ-অধ্যায়ের দুটি পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ এবং হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হব এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণ ও আশ্রমধর্মের ধারণা, বর্ণভেদ অনুগত নয়, পেশাগত- এ-ধারণা, যুগধর্ম, ব্রতপালন, ব্রতপালনে করণীয়, শিবরাত্রির ব্রতকথা এবং ব্রতপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হব।

এ-অধ্যায়ের শেষে আমরা-

- ☐ হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সংক্রান্তভাবে বর্ণনা করতে পারব
- ☐ জীবনচরণে হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ ঘটাতে পারব
- ☐ বর্ণ ও আশ্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ বর্ণ ও আশ্রমধর্মের বর্ণনা করতে পারব
- ☐ বর্ণভেদ পেশাগত, বংশানুক্রমিক নয় - ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ যুগধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ব্রতপালনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ শিবরাত্রির ব্রতকথা বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ব্রত ও ব্রতপালনে করণীয় ও ব্রতপালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ বর্ণে বর্ণে কোনো ভেদ নেই তা উপলব্ধি করে নিজ আচরণে তার প্রকাশ ঘটাতে পারব
- ☐ ব্রতপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো ব্রতপালনে উদ্বুদ্ধ হব।

প্রথম পরিচ্ছেদ হিন্দুধর্মের লক্ষণ

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে ধর্মের লক্ষণসমূহকে সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ- এ-দুভাবে ভাগ করা হয়েছে :

পাঠ ১ : ধর্মের সাধারণ লক্ষণ

সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর সজ্ঞে মনু প্রত্যায়োশে ধর্ম শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ করা। তাহলে ধর্ম শব্দটিতে যোমাছে ধারণশক্তি। এ- প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তি পর্বে বর্ণিত ধর্মের লক্ষণটি স্মরণ করা যায়।

‘ধারণাদু ধর্ম ইত্যাহুর্ধর্মো বিধুতা প্রজাঃ।

যাঃ সাদু ধারণ সংযুক্তাঃ স ধর্ম ইতি নেতরাঃ ॥’

অর্থাৎ, ধারণ ক্রিয়া (ধৃ+মনু) থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। ধর্ম সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে রয়েছে। সংক্ষেপে যা কিছু ধারণশক্তি সম্পন্ন তা-ই ধর্ম। এ ছাড়া অন্যকিছু ধর্ম নয়। যেমন- মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। আর এই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

অহিংসা সত্যমস্তে ন্য শৌচং সংযমমেব চ।

এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মস্য পঞ্চ লক্ষণম্ ॥ (মনুসংহিতা)

অর্থাৎ, হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, পবিত্র থাকা এবং সত্যবাদী হওয়া- এই পাঁচটিকে মনুষ্যত্বের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাহলে সেখা যাচ্ছে মনুষ্যত্ব রয়েছে পাঁচটি গুণের মধ্যে। গুণগুলো অনুশীলন করে একজন মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে। যদি সেখা যায় একজন মানুষ অন্যকে হিংসা করেন না, অপরের সম্পদ চুরি করেন না, জীবনে সত্যকে ধরে রেখেছেন, পোশাক-পরিচ্ছদে পবিত্র, চিত্তাভাবনায় পরিশুদ্ধ এবং জীবনধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযমী, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে আমরা মনুষ্যত্বের অধিকারী বলব। আর এরূপ পরিশোধিত ব্যক্তিই হলেন হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ মানুষ। উক্ত পাঁচটি গুণই মানুষকে মানুষ করেছে। তাই এগুলো হিন্দুধর্মের মনুষ্যত্বের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্ম নষ্ট হলে মানুষের ক্ষতি হয়।

একক কাক্স : ধর্মের সাধারণ লক্ষণ হোমার ব্যস্ত ব জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে লেখ।

নতুন শব্দ : সংযমী, মনুষ্যত্ব, স্মরণ, পরিশুদ্ধ।

পাঠ ২ ও ৩ : ধর্মের বিশেষ লক্ষণ

ধর্মের সন্ধারণ লক্ষণ বর্ণনার পর ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। ধর্মের বিশেষ লক্ষণ সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে :

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ অসত্যং হ্রিয়মাত্মনঃ ।

এতচ্চারত্বং প্রকৃত্বা সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ । (২/১২)

অর্থাৎ, বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী – এই চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। এই চারটিকে অনুসরণ করে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করা যায়।

বেদ

সনাতন ধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে বেদ। বেদ অদি ধর্মগ্রন্থ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদের ঋষিগণ ধ্যানমগ্ন হয়ে ভগবানের বাণী লাভ করেছেন এবং সে- বাণীসমূহ কালক্রমে লিপিবদ্ধ হয়ে বেদগ্রন্থ হয়েছে। আমরা জ্ঞানি বেদ চারটি। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ। জীবনক্ষেত্রে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম এটা বীমাংসার প্রশ্নে বেদের মতকেই গ্রহণ করতে হয়।



স্মৃতিশাস্ত্র

বেদের পরে সবারকম কর্তব্যকর্মের উপদেশ দিয়ে রচিত হয় স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রগুলো রচিত হয়েছে বেদের নির্ধারিত মতামত দিক রেখে। স্মৃতিশাস্ত্রে র নিয়ম, নির্দেশ মেনে চললে ধর্মার্থ নির্ণয় করা সহজ হয়।

সদাচার

সৎ + আচার = সদাচার। সৎ বাস্তবিক আচার আচরণে ধর্মের প্রকাশ ঘটে থাকে। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে র মাধ্যমে যদি ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে সমাজে মহাপুরুষদের আচার-আচরণ ও উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করাই ধর্ম।

বিবেকের বাণী

উপরের অঙ্গোচিত বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার অনুসরণ করেও যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে মানুষকে তার নিজস্ব বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। মানুষের পরিচয়ে বলা হয় মানুষ বিবেকবান প্রাণী। তাই বিবেকবুদ্ধি অবলম্বন করে জীবনপথে চলতে হয়। সর্বক্ষেত্রে ধর্মনির্দেশ মেনে চলা অঞ্চলজনক

নাও হতে পারে। যেমন- শাস্ত্রে র নির্দেশ হচ্ছে সত্য কথা বলা ধর্ম, আর মিথ্যা বলা পাপ। এ-নির্দেশ সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি দেখা যায় মিথ্যা বললে একজন ভালো মানুষের জীবন রক্ষা হয়, তখন মিথ্যা বলাই ধর্ম। এরূপ ক্ষেত্রে সত্য বলা ধর্ম নয়। এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বর বা বিবেকের নির্দেশ দিয়ে ধর্মার্থে নির্ণয় করতে হয়।

পাঠ ৪ ও ৫ : হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন তথা হিন্দুধর্মের বিকাশ শুরু হয়েছে। হিন্দুধর্মে চিত্তাশীল মুনি-ধর্মীগণ মানুষের কল্যাণচিন্তায় ধর্মীয় আচার-অভ্যাসে এমনকি পারমার্থিক চিন্তায় নতুন নতুন ধর্মীয় ভাব প্রবর্তন করেছেন। বৈদিক যুগে ধর্ম কর্ম নির্ধারিত ছিল যজ্ঞকর্ম রূপে। যজ্ঞক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৈদিক যুগে দেবতাদের আরাধনা করা হতো। যজ্ঞকর্মের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি হতে পরত কিন্তু মানুষের মুক্তিলাভ হতো না। তাই বেদের পরে উপনিষদের যুগে মুক্তির চিন্তা প্রাধান্য পায়। মানুষ মুক্তিলাভের জন্য এক ব্রহ্মের আরাধনা করতে থাকে। এ-সময় সমাজে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। কাশ্যক্রমে এ-চিন্তার মধ্যেও মানুষ যেন লব্ধ হতে পারল না। এ-অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবির্ভাব হয়। তখন ছিল যাপ্য যুগ। সমাজজীবনে সন্ন্যাসের পরিবর্তে কর্মের দিকে মোড় ফেরানো হলো। তিনটি ব্যাখ্যা করে বললেন, কর্ম ত্যাগ নয়, কর্ম করতে হবে ভোগ-আকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়ে। মনে করতে হবে সমস্ত বিশুদ্ধতা ভগবানের বিরাট কর্মক্ষেত্র। আর এখানে মানুষ ভগবানের কর্ম করে যাচ্ছে এবং কর্মের ফলও ভগবানেরই প্রাপ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই শিক্ষা তথা কর্মযোগের বিষয়টি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কর্মযোগে অদ্বীলন করে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে।

এরপর আসে ভক্তিবাদের কথা। মানুষ ঈশ্বরকে সাকারে উপাসনা করতে থাকে। বহু দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ হিন্দুসমাজে চলতে থাকে। ভগবানকে সাকারে আরাধনা করে তত্ত্বা মুক্ত হতে পারে। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনায় সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন- শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। এই সম্ভ্রমায়ুগের মধ্যে অসহিষ্ণু ভাব দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেবের অবির্ভাব ঘটে। তিনি শ্রমভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এ-ধর্মের প্রধান লক্ষ্য ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা, সমাজে বর্ণবিভেদ দূর করা ও শান্তি স্থাপন করা।

উনিষদ শতকে এসে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ দিয়ে হিন্দুধর্মে অনেক আচার আচরণে সংস্কার সাধন করা হয়। মূর্তিপূজার পরিবর্তে আসে এক ব্রহ্ম চিন্তা। আর স্থপতি হয় ব্রাহ্মসমাজ। অপরদিকে মূর্তিপূজার মাধ্যমে যে মানুষ ঈশ্বর লাভ করতে পারে, এ-ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের সংনয় সৃষ্টিভিত্তিক হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মে পুরাতন ও নতুন চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটে।

সংক্ষেপে হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটেছে বৈদিক যুগে, যজ্ঞ কর্মে, বেদান্তের ব্রহ্মসংখ্যান, গৌরগণিক যুগের দেব-দেবীর উপাসনায়, রূপের যুগে শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগে, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদনায়; আর আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর ভাব অনন্ত, তাঁকে পাওয়ার পথও বিচিত্র। সাধনপথে যে-কোনো প্রচলিত পন্থতি অনুসরণ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্ম। ধর্মভরণে মানবকল্যাণকে অবশ্য প্রাধান্য দিতে হবে। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন; তাই মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা। এই ধর্মবোধে বিশ্বাসী হয়ে আমরা জীবনে সেবধর্ম অদ্বীলন করব এবং মানবতাবোধ জাগ্রত করতে যত্নবান হব।

সম্মীয় কাজ : ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ তোমাকে মানবতাবোধে বীভাবে উদ্গুণ্য করছে এ-সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : স্মৃতিশাস্ত্র, বেদান্ত, বেদান্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম বিশ্রাস

পাঠ ১ : বর্ণভেদ

আমরা হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ এবং হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এখন বর্ণের ধারণা সম্পর্কে অবগত হব।

হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। ব্রাহ্মণ, ফরিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের কথা বেদ থেকেই জানা যায়। সমাজে সকল মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা সমান নয়। কর্মের যোগ্যতা অনুসারে প্রাচীনকাল থেকে এ-ধর্ম বর্ণবিভাগ রয়েছে। সমাজে যারা জ্ঞান-বুদ্ধিতে উন্নত তারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়। এরা জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান বিতরণ এবং ধর্মকর্ম নিযুক্ত থাকতেন। আবার রাজকর্ম্যে কুশলী, দেশকে রক্ষা করার শক্তিতে দক্ষ, এই শ্রেণির লোকদেরকে বলা হতো ফরিয়। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, শস্যাদি উৎপাদনকর্ম্যে উৎসাহী ব্যক্তিরা হলেন বৈশ্য। শ্রমজীবী ব্যক্তিদেরকে শূদ্র শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পাঠ ২ : বর্ণভেদ পেশাগত, বংশানুক্রমিক নয়

কালক্রমে এই বর্ণপ্রথা জন্মগত হয়ে দাঁড়ায়, যেমন – ব্রাহ্মণের সন্তান হয় ব্রাহ্মণ, ফরিয়ের সন্তান হয় ফরিয়, অনুপূত্রভাবে বৈশ্য, শূদ্র জন্মগত অধিকারে পরিচিত হয়। এর ফলে দেখা গেল একই পরিবারের চার সন্তান চার রকম গুল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু জন্মগত কর্মবিভাজনে তাদের চারজনকে একই কর্ম করতে হচ্ছে। ফলে কর্মের দক্ষতা এরা সেবাতে পারছে না। তাই হিন্দুধর্মের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন সমাজে বর্ণবিভাগ্যাস হয়েছে কর্মের যোগ্যতা অনুসারে। বর্ণভেদ পেশাগত; অবশ্যই বংশানুক্রমিক নয়। স্বপ্নবাদের একটি মতো বর্ণিত হয়েছে, একজন স্বধি বলছেন, আমি বেদমন্ত্র প্রকটা স্বধি, আমার কন্যা যব ভেজে ছাতু বানিয়ে বিক্রি করে এবং আমার ছেলে চিকিৎসক। এ থেকে বোঝা যায়, বর্ণভেদ বংশানুক্রমিক ছিল না। তা ছাড়া সাধনার গুণে ফরিয় রাজপুত্র বিশুমিত্র তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। বৈশ্য থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার দৃষ্টান্তও ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। শ্রীমদভগবদ্গীতাকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে তিনি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। (গীতা, ৪/১৩)। কিন্তু একালেও বংশের ভিত্তিতে বর্ণ নির্ধারিত হয়েছে। এ-বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ প্রথা হিন্দুধর্মাবলম্বী একত্বের জন্য প্রতিবন্ধক এবং আত্মত্বের বন্ধনের প্রতিবন্ধক। সমাজ পরিবর্তনশীলভায়ে এ-প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের সচেতন পরিবারগুলো এ-প্রথার গোঁড়ামির প্রতিবন্ধক অবস্থান নিয়ে পারিবারিক কাজ সম্পাদন করছেন। পেশাগত বর্ণভেদের মূল লক্ষ্য ছিল পেশার উৎকর্ষসাধন ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক মজলসাধন করা। বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ সমাজের সচেতন মানুষের নিকট কুসংস্কার ব্যতীত অন্যাক্ষিক নয়। তাই এ-দৃষ্টিভঙ্গির আরও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

এক কাল: ‘হিন্দুধর্ম বর্ণভেদ প্রথা আত্মত্বের বন্ধনের প্রতিবন্ধক’ – এ-সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : বর্ণভেদ, কুশলী, ব্রাহ্মণ, ফরিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

পাঠ ৩ : আশ্রমধর্ম

আশ্রমধর্ম হিন্দুসমাজে একটি বিশেষ দিক। প্রাচীনকালে স্বাধিগণ মানবজীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখেছেন, যেমন- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারটিকে একত্রে বলা হয় চতুর্ভুজ। মানুষের আয়ুষ্কাল যেটামুটি একশো বছর ধরা হয়। আর এই একশো বছরকে পঁচিশ বছর করে সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য আশ্রম। এ-সময়ে গুরুগৃহ থেকে বিদ্যা অর্জন করার বিধান। দ্বিতীয় পর্যায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গার্হস্থ্য জীবন। এ-সময়ে ব্রহ্মচর্যী গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে বিবাহ সম্পন্ন করে সংসারধর্ম পালন করে। পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হলে সংসার ত্যাগ করে ধর্মমুশীলনের জন্য বনে যাওয়ার কথা। এটি চলবে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত। এ-পর্যায়কে বলা হয় বানপ্রস্থ। শেষ পঁচিশ বছরে আসে সন্ন্যাসধর্মের কথা। তখন মানুষ ধর্মমুশীলনে আত্মনিয়োগ করে। উক্ত এই চারটি ভ্রমের নির্বাহিত কর্মই হচ্ছে আশ্রমধর্ম।

নতুন শব্দ : ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, চতুর্ভুজ, আয়ুষ্কাল।

পাঠ ৪ : যুগধর্ম

হিন্দুধর্মের মতে যুগ হচ্ছে চারটি- সত্য, ত্রেতা, যুগের ও কলি। মানবসভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়কে ধরা হয় সত্য যুগ। এ-যুগে মানুষ ছিল ধর্মপ্রাণ। তাদের জীবন ছিল সংকর্মময়। তখন ধর্ম ছিল পূর্ণ, হোল আনা। এর পরে আসে ত্রেতা যুগ। এ-সময়ে মানুষের জীবনচর্যা কিছু কিছু অসত্য এবং পাপের প্রকাশ ঘটে। তখন সমাজে হয় এক ভাগ পাপ আর তিন ভাগ ধর্ম। সমাজে ধর্ম নৈতিকতার প্রভাব তখনও বেশি থাকায় অধর্ম দুর্বল হয়ে থাকে।

পরবর্তী যুগকে বলা হয় যুগের যুগ। এ-সময়ে ধর্মের প্রভাব আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাপ, অন্যায়, অত্যাচার বেড়ে যায়। এখানে এসে ধর্ম ও অধর্ম সমান সমান হয়ে যায়। এ-সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবিরূত হয়ে সমাজে দুষ্টকর্তাদের বিলাস সাধন ও সং ব্যক্তিরদের দুঃখমোচন আর ধর্ম সংস্খপন করে গেছেন।

এরপর আসে কলিযুগ। এ-সময়ে ধর্মের অবস্থা আরও দুর্বল হয়। অপরদিকে অধর্ম তথা পাপকর্মের বৃদ্ধি ঘটে। মানুষের ধর্মবোধ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ-অবস্থায় অবতার রূপে আসেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর প্রচেষ্টায় সমাজ প্রেমভক্তি প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সমাজজীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

চার যুগের আচরণের জন্য শাস্ত্র ধর্ম-কর্মের নির্দেশ রয়েছে। তাকে বলা হয় যুগধর্ম।

তপঃ পরং সত্যযুগে ব্রোতায়ান্ জানমুচ্যতে।

যাপরে যজ্ঞমেবাক্ত দানমেবকং কলৌ যুগে।

অর্থাৎ, সত্যযুগে তপস্যাই ছিল প্রধান ধর্ম; ব্রোতা যুগে জ্ঞান প্রধান ধর্ম, যাপরে যজ্ঞ প্রধান ছিল আর কলি যুগে দানই প্রধান ধর্ম।

একক কাজ : যুগধর্ম অনুযায়ী চার যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

নতুন শব্দ : সংকর্মময়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ব্রোতা, যাপর।

পাঠ ৫ : ব্রত ও তপস পালনে করণীয়

হিন্দুধর্মের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে পূজা, উপাসনা, পার্বণ ও ব্রতপালনের বিধান রয়েছে। পূজা অর্পণ ও পাপ হতে মুক্তির ইচ্ছায় অর্পিত ধর্মকর্মকেই ব্রত বলে। অর্থাৎ ব্রতপালনের উদ্দেশ্য হলো কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিশেষ কিছু আচার-নিয়ম পালন। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা বিপত্তারিণী ব্রত, জামাইস্বামী ব্রত, জন্মান্বিতী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত ইত্যাদি অনেক ব্রত পালন করে থাকেন।

ব্রতপালনের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ব্রতের আগের দিন সংযম পালন করতে হয় এবং ব্রতের দিন ব্রত শেষ হওয়া পর্যন্ত উপবাস অবশ্য করণীয়। যে-দিনে বা তিথিতে যে-ব্রত উদ্‌যাপন করা হয় সে-দিনে বা তিথিতে ভক্তগণ উপবাস থেকে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে থাকেন। প্রতিটি ব্রতের ব্রতকথা আছে। ব্রতপালনের সময় সুনির্দিষ্ট ব্রতকথা বলা বা পাঠ করা হয়। ভক্তগণ ভক্তিসহকারে সে ব্রতকথা শোনেন।

শিবরাত্রি

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে শিবের আরাধনা করা হয়। এটি শিবরাত্রি ব্রত হিসেবে পরিচিত। শিব মঙ্গলময়। তিনি জগৎ‌তর অকল্যাণ, অসুখ, অন্যায় দূর করে থাকেন। শিবশক্তি কল্যাণকর শক্তি। তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য যে ব্রতপালন করা হয় সেটি শিবরাত্রি ব্রত হিসেবে খ্যাত। এই ব্রত সম্পর্কে কাহিনী শোনা যায়— এক সময় শিব-পার্বতী একত্রে অবস্থান করছেন। পার্বতী শিবকে প্রসন্ন করছেন, তিনি কিসে তুষ্ট হন? শিব উত্তরে বলেন, ‘যে ব্যক্তি উপবাসী হয়ে ভক্তি ভরে একটিমাত্র বিদ্যুৎ দিয়েও আমার অর্চনা করেন আমি তাতেই তুষ্ট হই। বহু উপায়ে আমার অর্চনা করার প্রয়োজন হয় না। যে দেবী, এই হলো আমার প্রীতিকর ব্রত। এই ব্রতের ফলস্বরূপ ভক্ত তাঁর বাসনার বন্ধ পেয়ে থাকেন। আমার অনুগ্রহ তাঁর প্রতি সর্বদা বর্ষিত হয়।’



শিব বলেন, তিনি ভক্তের ভক্তি সেনেহন, আর তাঁর শ্রদ্ধাসহ বিদ্যুৎ‌দ্বারা অঞ্জলিতে তুষ্ট হন। শিবরাত্রি ব্রত পালনের কিছু নিয়ম রয়েছে। যেমন— শিবরাত্রির আগের দিন থেকেই ভক্ত সাংযম অবলম্বন করবেন। বাক্যে, কর্মে, চিন্তায় সেহ-মনকে পরিষ্কার রাখবেন। উপবাস থেকে সারাদিন প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যেও শিবকে মন্ত্রণ করবেন। শিবরাত্রির আনুষ্ঠানিক কর্মের মধ্যে থাকবে—রাত্রির চার প্রহরে শিবকে চারবার অর্চনা করা। প্রথম প্রহরে শিবকে জ্বাল করতে হয় দুধ দিয়ে। দ্বিতীয় প্রহরে নমি দিয়ে। তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে। প্রতিবার স্নানের শেষে পূজা ধ্যান করতে হবে। এভাবে সারারাত্রি শিবের পূজা করবে। পরের দিন ভক্ত শিবকে পূজা দিয়ে উপবাস তেড়ে পারণ করবে।

দর্শনীয় কাজ : ব্রত পালনের উদ্দেশ্যসমূহ মনে আলোচনা করে খাঁতায় লেখ।

নতুন শব্দ : ব্রত, বিদ্যুৎ, অঞ্জলি।

পাঠ ৬ : শিবরাত্রির কথন

শিবরাত্রির একটি ব্রত কথা আছে। এখন শিবরাত্রির ব্রতকথাটি শোনা যাক –

‘শিবরহস্য’ নামক ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, পুরাকালে বারানসী নগরে এক ব্যাধ বাস করতেন। বর্ষ মেঘ, কৃষ্ণকয়া, নিজল চোখ, নিজল চুল। সেখান থেকে নামের ছিলেন সেই ব্যাধ। অবার তাঁর সঙ্গে থাকত পশুপাশি ধরার জাল, অস্ত্র শস্ত ইত্যাদি। বনের পশুপাশি শিকার করে তাদের মাংস বিক্রি করাই ছিল তাঁর পেশা। এখন একদিন তিনি বনে গিয়ে গুহর পশু শিকার করলেন। তারপর মাংসের তার বহন করে বাড়ির দিকে রওনা করলেন। বোঝা খুব ভারী ছিল। চলে গিয়েছিলেন গভীর বনে। ক্রান্ত প্রান্ত হয়ে তিনি বিশ্রামের জন্য একটি গাছের গোড়ায় শুয়ে পড়লেন। দারুণ ক্লান্তিতে তিনি অতি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য অস্ত্র সেল। রাত নামল। চতুর্দশী তিথির অম্বকারে রাত। গভীর অম্বকারে তিনি কী করে বাড়ি ফিরবেন। অম্বকারে বন্দপশূরা যদি অক্রমণ করে। তিনি তখন যে-গাছের নিচে শুয়েছিলেন তার ডালের সাথে শিকার-করা পশুর মাংসের বোঝা কুলিয়ে রাখলেন। তারপর নিজেও চড়ে বসলেন ঐ গাছের ডালে। গভীর ছিল বেলপাখ। গভীর রাতে শীতল ও জুয়ার ব্যাঘের শরীর কাঁপতে লাগল। তার উপর শিশির পড়ছিল। ঠাণ্ডা শিশিরে ব্যাঘের কাঁপনি সেল বেড়ে।

ঘটনাক্রমে সেই বেলগাছের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ। শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে শিবের পূজা করতে হয়। শিবকে বেলপাতা দিয়ে, জল দিয়ে পূজা করতে হয়। ব্যাধ শীতে কাঁপছিলেন এবং সজোরে গাছের ডাল ভেঙে ধরছিলেন। তাতে করে শিশিরভেজা বেলপাতা অগ্না থেকেই ছিন্ন হয়ে শিবলিঙ্গের উপর পড়ল। এভাবেই ত্রো ভক্তেরা জল ও বেলপাতা দিয়ে শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে শিবের পূজা করে থাকেন। ঐ ব্যাধও জল (শিশির) ও বেলপাতা দিয়ে নিজের অজান্তেই শিবের পূজা করে যেলেন। তিথিমাহাত্ম্যে ব্যাধ ও শিবপূজার পুরাণ অর্থন করলেন। কিন্তু ব্যাধ নিজের ও তা জানতে পারলেন না।

ব্যাধ যখন মারা গেলেন তখন যমদূতেরা চলে এলেন তাঁর আত্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ তিনি জীবনে যে-পাপ করেছিলেন তার জন্য তাঁকে নরকবাস করতে হবে। কিন্তু তৎকালে চলে এলেন শিবদূতেরা। শিবদূতেরা তাঁকে শিবধামে নিয়ে যাবেন। তখন শিবদূত ও যমদূতদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। পাপের ফলে যার যমালয়ে যাওয়ার কথা তাঁকে শিবদূতেরা শিবধামে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু শিবদূতদের জন্য যমদূতেরা ব্যাঘের কাছে যেখানে পারছেন না। তখন তাঁরা যমরাজের কাছে গিয়ে ঘটনাটি জানালেন। যমরাজ তখন শিবধামে গিয়ে শিবের সেরক নন্দীর কাছে জানতে চাইলেন, একজন যার পাপীকে কেন যমালয়ের পরিকর্তে শিবধামে নেওয়ার জন্য শিবদূতেরা গিয়েছেন। ঐ ব্যাধ কী এমন পুণ্য করেছেন, যার জন্য বহুপুণ্যের ফলে যে-শিবধাম পাওয়া যায় সেই শিবধামে যাওয়ার যোগ্য হলেন?

তখন নন্দী যমরাজকে এক শিবচতুর্দশী তিথির রাত্রে নিজের অজান্তে জল ও বেলপাতা দিয়ে শিবের পূজা করার কথা জানালেন, ‘পাপীও যদি শিবরাত্রিতে যথাবিধি শিবের পূজা করে, তাহলে তার সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটে এবং সে পুণ্যবান হয়ে শিবধামে প্রাপ্ত হয়। এভাবেই ঐ ব্যাঘের সকল পাপের বিনাশ ঘটেছে এবং সে পুণ্যবান হয়ে শিবধামে প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে।’

শিবচতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা শুনে যমরাজ বিম্বিত হলেন। এভাবেই শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা কৈলাশ, সেনলোক ও পৃথিবীতে প্রচারিত হলো। তখন থেকে শিবভক্তেরা প্রতি বছর শিবরাত্রি ব্রত করে আসছেন।

নতুন শব্দ : শিবচতুর্দশী, শ্রান্ত, ব্যাধ, নিজল।

পাঠ ৭ : ব্রতপালনের গুরুত্ব

হিন্দুধর্মের একটি বিশুদ્ধ এই যে, ব্রত পালন করলে উদ্ভিদ সেবতা ব্রতীর আকাজকা পূরণ করবেন। 'ব্রতের মাধ্যমে আমার আকাজকা পূরণ হবে'- এ-আত্মবিশ্বাসের জাগরণ এবং সেই আকাজকা পূরণের জন্য ব্রতীর ক্রিয়াশীল হওয়া ব্রতপালনের একটি বিশেষ প্রাপ্তি।

ব্রত্রে অঙ্গনা কেটেও আকাজকার প্রকাশ ঘটানো হয়। যেমন- ধানের গোলা অঁকলে ব্যস্ত বে প্রকৃত ধানের গোলা হবে। সেজুতি ব্রতের একটি মন্ত্র হচ্ছে :

আমি দিই পিঁড়ির গোলা।

আমার হোক সত্যিকারের গোলা।

লক্ষ্মীদেবীর পায়ের চিহ্ন অঁকলে সেই চিহ্নে পা ফেলে ফেলে লক্ষ্মীদেবী নিজেই ঘরে আসবেন। ব্রতীকে ধনসম্পদ দান করবেন। ব্রতী সুখী হবেন।

অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতকথা আমাদের দানের প্রতি উৎসাহিত করে। অন্নপাণ্ডী ব্রত করলে সত্যানুসঙ্গিত দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্যশালী হয়। দুর্গাষ্টমী ব্রত করলে সাতপুরুষ সুখে থাকে যায় এবং দুর্বার মতো সর্গীষ ও অসম্পন্ন হয় বংশের সকলের জীবন।

এভাবে ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে ব্রতীর আকাজকা পূর্ণ হয়। ব্রতকে কেন্দ্র করে উপবাসের মধ্য দিয়ে সেহ ও মন সংযত হয়। শরীর ও মন দুইই ভালো থাকে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।
২. হিন্দুধর্মের বর্ণগ্রন্থ নয়।
৩. আমাদের জীবনে কে ধরে রাখতে হবে।
৪. জটিল পরিস্থিতিতে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়।
৫. রাজপুত্র বিশুমিত্র বলে ব্রাহ্মপুত্র অর্জন করেছিল।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বহু সাধকের সাধনায় ফলস্বপ্ন নিয়ে	ধর্ম
২. সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে রয়েছে	বিকশিত হচ্ছে ধর্ম
৩. বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র , সদাচার ও বিবেকের দ্বারা এই চারটি	বেদ
৪. হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ	প্রাণী
৫. মানুষ বিবেকবান	ধর্মের লক্ষণ
	মহাত্ম্য

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. সদাচারের ধারণা উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর।
২. যজ্ঞকর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
৩. কর্মযোগ বলতে কী বোঝায়?
৪. ধর্মচারণের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণগুলো মেনে চলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
২. হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো বিশ্লেষণ কর।
৩. বর্ণপ্রথায সৌভ্রমির দিকটি বিশ্লেষণ কর।
৪. হিন্দুধর্ম বিকাশের পরিচয় দাও।
৫. শিবরাত্রি পালনের বৌদ্ধিকতা বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন ধাতু থেকে?

ক. ধৃ

খ. গম্

গ. বদ্

ঘ. দৃশ্

২. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ কয়টি?

ক. চার

খ. পাঁচ

গ. আট

ঘ. দশ

৩. মানুষের ধর্ম হচ্ছে—

- i. মানবতা
- ii. মমতা
- iii. মনুষ্যত্ব

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সত্যোষবাবু শিক্ষকতা করেন। তিনি নিজে পড়েন, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পড়েন। ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিক্ষকতার আনন্দসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি সুখে আছেন।

হিন্দুধর্ম অনুসারে সত্যোষবাবু কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. ব্রাহ্মণ | খ. ক্ষত্রিয় |
| গ. বৈশ্য | ঘ. শূদ্র |

সত্যোষবাবুকে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ—

- i. কর্ম
- ii. জন্ম
- iii. দক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

কালু চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এই কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনেকেই তাকে বোঝাসে কালু এই কাজ ছাড়তে পারে না। একদিন সে চুরি করতে গিয়ে নদীতে পড়ে হাবুডুপু নেতে থাকে। সজল নদীর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় কালুকে দেখতে পায়। কালুর কাজকর্ম সম্পর্কে তার জানা থাকলেও সে কালুকে নদী থেকে টেনে তোলে।

- ক. মহাত্মারতের কোন পর্বে ধর্মের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে ?
- খ. বেলকে সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি বলার কারণ ব্যাখ্যা কর ?
- গ. সজলের আচরণের মাধ্যমে ধর্মের যে বিশেষ লক্ষণটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী কালুর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যকর্ম ও যোগাসন

নিত্যকর্ম ও যোগাসন

নিত্যকর্মগুলো হলো পরম পবিত্র কর্ম। নিত্যকর্ম অনুশীলন করলে যোগ, তপ, সাধনা, কাজকর্ম, উপভোগ, আনন্দ, সফলতা সমস্ত কর্মই ভালো লাগে এবং জাগতিক ও পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয়। শরীরই ধর্মকর্মের মূল অধার। সুতরাং দেহের নীরোগ ও মন শান্ত রাখার জন্য সকলেরই যোগাসন অনুশীলন করা অবশ্যকর্তব্য।



গোমুখাসন, হুজ্জাসান, বজ্রাসন, নিয়মিত অনুশীলনে বহুমুখী সুফল লাভ করা যায়। এই অধ্যায়ে নিত্যকর্ম অনুশীলনের প্রস্তাব ও যোগাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ-অধ্যায়শেষে আশ্রয়-

- ☐ নিত্যকর্ম অনুশীলনের প্রস্তাব বর্ণনা করতে পারব
- ☐ গোমুখাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ গোমুখাসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব

- □ গোমুখাসন অনুশীলন ও এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- □ জুজ্ঞাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ জুজ্ঞাসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- □ জুজ্ঞাসন অনুশীলন ও এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- □ বজ্রাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ বজ্রাসন অনুশীলনপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- □ বজ্রাসন অনুশীলন ও এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১ : নিত্যকর্ম অনুশীলনের প্রভাব

নিত্যনৈমিত্তিক সদাচারই মনুষ্যজীবনের অমূল্য সম্পদ। যারা নিত্যকর্ম অনুশীলন করে তাদের মন ধীর, স্থির ও শান্ত থাকে, শরীর ভালো ও কর্মঠ থাকে এবং তাদের জীবন শুল্ক, পবিত্র ও নির্মল হয়। মানুষ যখন নতুন গৃহস্থ্য কর্ম আরম্ভ করে তখন তাদের কিছুই থাকে না। দুই-চার বছর পরে যদি তারা ঘর পরিভ্রমণ করে তখন তাদের এত জিনিসপত্র হয়ে যায় যা নিতে ট্রাক বা গাড়ির প্রয়োজন হয়। সেরকম মানুষ যদি প্রতিদিন নিত্যকর্মে ব্যস্ত থেকে অন্যকর্ম করে তাদের নিত্যকর্ম সফলীয় বিশাল জ্ঞান লাভ হয়। যারা কিছুই করে না তাদের সামনে সবকিছুই বোকা মনে হয় এবং নিজস্ব কর্মেও আনন্দ, কুসংস্কার ও লোভেই থাকে। তারা শুল্ককর্ম এবং মঙ্গলচিন্তা করতে সমর্থ হয় না।



নিত্যকর্মের দ্বারা শুল্ককর্মের ফল সর্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রত্যেকের শুল্ককর্ম করার জন্য একটা সময় নির্ধারণ হয়ে যায়। নৈতিক নিত্যকর্মকর্তাদের ঘরও পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, শুল্ক, পবিত্র থাকে। বিছানায় ঘুম ভাঙতেই প্রথমতঃ অমৃত বেশার শুল্ক সংগ্রহ করে মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে শুল্কা ভক্তিতে ঈশ্বরকে ভক্তবে আনন্দ্য দূর হয়ে যায় এবং সমস্ত দিন সুন্দরভাবে কাটে থাকে। প্রাতঃকালের আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফল দিদের যে-কোনো সময়ে অদৃষ্টিত

পারমার্থিক কার্যকলাপের ফল থেকে অনেক বেশি। প্রতিদিন গুরুজনকে নমস্কার করলে তাঁদের প্রতি কখনও ব্যাধি ব্যবহার, অসম্মান, অমর্যাদা করার সাহস হয় না। নমস্কার বিনম্রতার প্রতীক। সৌজন্য পিতামাতা, বিধ্বা, বয়োবৃদ্ধ, গুরুজনদের প্রতি নিত্য নমস্কার করা উচিত যাতে অশ্রদ্ধা সেখানে বিনম্রতা হয় এবং বিদুষ্ট আচরণ না হয়।



প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা যোগব্যায়াম শরীরকে কেন্দ্র করেই হয়। ‘শরীরং আদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্’- শরীরই ধর্মকর্মের মূল আধার। সুতরাং যোগাসন প্রতিদিন নিয়মিত করলে শরীর সুস্থপুষ্ট, বলবান, শক্তিশালী, গুজবী, তেজস্বী থাকে এবং উগ্রম ভাবনায় আগ্রহমূলক কর্মের প্রচেষ্টা হয়। মানুষমাত্রই শক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে। প্রতিদিন পূজা-অর্চনা, উপাসনাদি দ্বারা ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে এবং তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানানোর ফলে আধ্যাত্মিক ত্রুতনা জাগ্রত হয় এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। নিষ্কর্মীদের কোনো কর্মেই মন লাগে না। যা কিছু করে বধ্যাত্মমূলক, ইচ্ছা না থাকলেও করে। তারা জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

সুতরাং নিত্যকর্মগুলো হলো পরম পবিত্র কর্ম। নিত্যকর্ম অনুশীলন করলে যোগ, তপ, সাধনা, কাজ, কর্ম, উপভোগ, আনন্দ, সফলতা সমস্ত কর্মই ভালো লাগে এবং জাগতিক ও পারমার্থিক মজল লাভ হয়।

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত দৈনিক নিত্যকর্মাদি করা এবং অত্যাধিকার ধর্ম, কর্মাদি, মন্ত্রার্থ, মননের সঙ্গে আচরণ করা।

নতুন শব্দ : সদ্ভাচার, গৃহস্থকর্ম, ব্রহ্মযজ্ঞ, অমৃত বেলা, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, গুজবী, তেজস্বী, তপ, নিষ্কর্মী, জাগতিক।

পাঠ - ২, ৩ ও ৪ : গোমুখাসনের ধারণা, অনুশীলন পদ্ধতি ও প্রভাব

গোমুখাসনের ধারণা :

এই আসনে অবস্থানকালে আসন অভ্যাসকারীর পায়ের অবস্থান গবুর মুখের মতো হয়, তাই এই আসনের নাম গোমুখাসন।

অনুশীলন পদ্ধতি

দুই সামনের দিকে লম্বা করে ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে। তারপর ডান পা হাঁটুতে চেঁচে বা পায়ের হাঁটুর উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান পায়ের গোড়ালি বা নিতম্বের স্পর্শ বরাবতে হবে। বা পা হাঁটুতে চেঁচে বা পায়ের গোড়ালি ডান নিতম্বের পাশে স্পর্শ করাবে হবে। এবার ডান হাত মাথার উপর তুলে কনুইতে চেঁচে ডান হাতের পাতা ঘাড় বরাবর পিঠের উপর নামবে। বা হাত কনুইতে চেঁচে পিছনে পিঠের উপর দিকে নিতে হবে। দুহাতের আঙুলগুলো বড়শির মতো করে এক হাত আর এক হাতের সঙ্গে আটকে দিতে হবে। ঘাড় আর মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে। শ্বাসপ্রশ্বাস আন্তরিক রেখে এভাবে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। তারপর হাত দুটো ছেড়ে, পা দুটো আগের মতো লম্বা করে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ডানের জায়গায় বা আর বাঁয়ের জায়গায় ডান ধরে অর্থাৎ হাত-পা বদল করে আসনটা আবার করতে হবে। এরপর ৩০ সেকেন্ড শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এরকম চারবার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ডান হাঁটু যখন বা হাঁটুর উপর থাকবে তখন ডান হাত উপরে উঠবে আর বা হাঁটু যখন ডান হাঁটুর উপর থাকবে তখন বা হাত উপর উঠবে।



একক কাজ : গোমুখাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রশ্নাব

গোমুখাসন নিম্নমিত অনুশীলন করলে—

১. পায়ের পেশি নমনীয় হয়, পায়ের বাধা দূর হয়।
২. হাঁটুর বাত নিরাময় হয়।
৩. পিঠের মাংসপেশির বাধা দূর হয়।
৪. অসমান কঁাধ সমান হয়।
৫. কঁাধের সন্ধিক্ষেত্র বাধা দূর হয়।

৬. মেবুদপ্র নমনীয় হয়, বাঁকা মেবুদপ্র সোজা হয়।
৭. পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ ও কোষ্ঠাবশ্যতা দূর হয়।
৮. হৃদয় শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৯. অনিদ্রা দূর হয়।
১০. মনের অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দূর হয়, মন শান্ত থাকে।

দলীয় কাজ : গোমুখাসন অনুশীলনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : গোমুখাসন, গোড়ালি, নিত্য, বাত, পেশি, পরিপাক যন্ত্র, নিরাময়, কোষ্ঠাবশ্যতা, নমনীয়, সন্ধিক্ষণ।

পাঠ - ৫, ৬ ও ৭ : ভুজঙ্গাসনের ধারণা, অনুশীলন পদ্ধতি ও প্রভাব

ভুজঙ্গাসনের ধারণা :

‘ভুজঙ্গ’ শব্দের অর্থ সাপ। এই আসনে অবস্থানকালে কোরন থেকে দেহের উপরের অংশকে উপরে তুলতে হয়। এই সময় এই আসন অভ্যাসকারীকে ভুজঙ্গ অর্থাৎ সাপ ফণী তুলসে যেমন দেখতে হয়, সেরকম হয়। তাই এই আসনের নাম ভুজঙ্গাসন। একে সর্পাসনও বলা হয়।



অনুশীলন পদ্ধতি :

শরীরের সমস্ত মাংসপেশিকে শিথিল করে পা দুটো-জোড়া ও লম্বা করে উপুড় হয়ে শুষে পড়তে হবে। পায়েল আঁতুলগুলো মাটির সাথে চেপে থাকবে। হাঁটু, উরু ও গোড়ালি সোজা থাকবে। দুহাত বন্টুইয়ের কাছ থেকে তেড়ে দু হাতের তালু উপুড় করে পাজরের কাছে দুপাশে মাটিতে রাখতে হবে। এরপর হাতের উপর অঙ্গ ভর দিয়ে তীব্র উপরে তুলে হাড় পিছন দিকে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে নতি পর্যন্ত শরীরের নিচের অংশ ভূমিসংলগ্ন রেখে দেহের উপরের অংশ হাতের উপর বেশি জোর না দিয়ে শুষ বুক ও কোমরের উপর জোর দিয়ে উপরে তুলতে হবে। এ-অবস্থায় সমস্ত শরীর শিথিল করে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আঙ্গ্রে আঙ্গ্রে পেট, বুক, হাড় ও তিবুক নামিয়ে ভূমিসংলগ্ন করতে হবে এবং ৩০ সেকেন্ড তিৎ হয়ে শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এইভাবে এই আসন ও শবাসন চারবার অভ্যাস করতে হবে। এই আসন অভ্যাসকালে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।

একক কাজ : ভুজঙ্গাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব :

ভূজকাসন নিম্নমিত অনুশীলন করলে—

১. মেহদত নমনীয় হয়।
২. বঁকা মেহদত সোজা ও সরল হয়।
৩. মেহদভের বাত সারে।
৪. পিঠের ও কোমরের পেশি মজবুত হয়, কোমরে ব্যথা হতে পারে না।
৫. স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হয়।
৬. শরীরের নিরুদ্ধ ভাব দূর হয় ও নতুন শক্তি জন্মায়।
৭. ক্লুপিভ ও ফুসফুস সবল হয়।
৮. বুকের গঠন সুন্দর হয় এবং সেহের লাভণ্য বৃদ্ধি পায়।
৯. যকুব ও প্রাহার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, হজমশক্তি বাড়ে।
১০. অজীর্ণ, অঞ্চল, অক্ষুধা, গ্যাস্ট্রিক, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগে সুফল পাওয়া যায়।
১১. যারা কোলকুন্ডো তাদের বিশেষ উপকার হয়।

নবীয় কাজ : ভূজকাসন অনুশীলনে কী উপকার হয়, তার একটি তালিকা তৈরি করা।

নতুন শব্দ : ভূজাঙ্গ, সিঁক, পাঁজর, সবেল্ল, নিরুদ্ধ জ, লাভণ্য, কোলকুন্ডো, যকুব, প্রাহার, অজীর্ণ, অঞ্চল।

পাঠ-৮, ৯ ও ১০ : বজ্রাসনের ধারণা, অনুশীলন পদ্ধতি ও প্রভাব**বজ্রাসনের ধারণা :**

যোশশাত্র হতে আসনটি অতাসে সেহের নিয়ন্ত্রণের স্নায়ু ও পেশি বজ্রের মতো কঠিন, মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। তাই আসনটির নাম বজ্রাসন। এটি খাণ্ডার পরে করা একমাত্র আসন।



অনুশীলন পদ্ধতি :

হাঁটু ভেঙে পা দুটো পিছন থেকে দুটো নিতম্বের নিচে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে গোড়ালি দুটো বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে এবং পায়ের পাতা নিতম্বের সঙ্গে লেগে থাকে। এই অবস্থায় দুপায়ের বুড়ো আঙুল পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবে কোমর, গ্রীবা এবং মাথা সোজা হয়ে থাকবে। দুই হাঁটু পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবে। হাতের কনুই না ভেঙে ডান হাত থাকবে ডান হাঁটুর উপর পাতা আর বাঁ হাত থাকবে বাঁ হাঁটুর উপর পাতা। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ৩০ সেকেন্ড বসতে হবে। তারপর ৩০ সেকেন্ড শ্বাসরুদ্ধে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে ৩/৪ বার অভ্যাস করতে হবে।

একক কাজ : বস্ত্রাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব :

বস্ত্রাসন নিম্নমিত অনুশীলন করলে—

১. হাঁটুর ও গোড়ালির গাঁটের ব্যতঙ্গনিত ব্যথা দূর হয়, সায়টিকা সারে।
২. পায়ের পেশি ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় হয়।
৩. অক্ষুধা ও অনিদ্রা দূর হয়।
৪. মনের চঞ্চলতা দূর হয়।
৫. স্বাস্থ্য সুন্দর ও লাভনাময় হয়।
৬. পরিপূর্ণ অহারের পর এ আসনটি ৫ থেকে ১৫ মিনিট অভ্যাস করলে বাদ্যবহু সহজে হজম হয় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।
৭. বস্ত্রাসনে বসে চুল ঝাঁড়ালে সহজে চুল পাকে না বা পড়ে না।

দলীয় কাজ : বস্ত্রাসনের উপকরিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : বস্ত্রাসন, সূদ্র, গ্রীবা, গাঁট, সায়টিকা, স্নায়ুজাল।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. নিত্য নৈমিত্তিক মনুষ্য জীবনের অমূল্য সম্পদ।
২. নমস্কার প্রতীক।
৩. সর্গাসন বলা হয়।
৪. গোমুখাসনে হাত আর মেহুদণ্ড থাকবে।
৫. সহজে চুল পাকেন না বসে চুল আঁচড়ালে।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নিত্যকর্মের দ্বারা শূভকর্মনিষ্ঠানিক ফল	গরুর মুখের মতো হয়
২. হাঁটু, উরু ও গোড়ালি সোজা থাকে	মূল আধার
৩. গোমুখাসনে অভ্যাসকারীর পায়ের আবহা ন	বজ্রাসনে
৫. শরীরই ধর্মকর্মের	সর্বমাই প্রত্যক্ষ করা যায়
	তুজজ্যাসনে

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. 'নিত্যকর্ম অনুশীলনে জাগতিক ও পারমার্থিক মজল হয়' - কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
২. তুজজ্যাসন অনুশীলন পদ্ধতির ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে লেখ।
৩. তুজজ্যাসন অনুশীলনে মেহুদণ্ডের ওপর কী প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা কর।
৪. গোমুখাসন অনুশীলনের উপকারিতা কী?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কয়েকটি নিত্যকর্ম উল্লেখ করে এর অনুশীলনের প্রভাব বর্ণনা কর।
২. গোমুখাসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. তুজজ্যাসন কীভাবে অনুশীলন করতে হয়?
৪. বজ্রাসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫. শরীর-মনে বজ্রাসন অনুশীলনের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন সময়ের আধ্যাত্মিক কর্মকলাপ অনুষ্ঠানের ফল অনেক বেশি ?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. প্রাতঃকাল | খ. পূর্বাঙ্ক |
| গ. মধ্যাহ্ন | ঘ. অপরাহ্ন |

২. যোগাসন অনুশীলনের পর বিশ্রাম নিতে হয় -

- | | |
|-------------|-------------|
| ক. সুখাসনে | খ. শবাসনে |
| গ. ভদ্রাসনে | ঘ. বীরাাসনে |

৩. গোমুখাসন নিম্নমিত অনুশীলন করলে -

- হাঁটুর বাত নিরাসয় হয়
- সেরসত শক্তি হয়
- পরিপাকবহ্নের গোলযোগ দূর হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়সী লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। সে উপুড় হয়ে শুয়ে হাঁটু, উরু ও গোড়ালি সোজা রেখে একটি আসন অনুশীলন করে এবং এর সুফলও উপলব্ধি করে।

৪. শ্রেয়সী কোন যোগাসনটি অনুশীলন করে ?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক. বজ্রাসন | খ. শবাসন |
| গ. ভূজঙ্গাসন | ঘ. গোমুখাসন |

৫. শ্রেয়সীর উক্ত আসনটি নিয়মিত অনুশীলনের ফলে -

- সেহের লাভণ্য বৃদ্ধি পায়
- হজমশক্তি বাড়ে
- হৃৎপিণ্ড ও হৃৎস্রুস সবল থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. মিত্রা অর্চন শ্রেণিতে পড়ে। সে লেখাপড়ার ভালো। কিন্তু সে নিয়মিত স্কুলে আসে না। শ্রেণিশিক্ষক কারণ জানতে চাইলে মিত্রা জানায় তার মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তার মায়ের সমস্যা হলো কোনো খাবার খাওয়ার পর উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েন এবং হজম করতে পারেন না। ঔষধ খাচ্ছেন কিন্তু সুফল পাচ্ছেন না। শিক্ষক সব শোনার পর মিত্রাকে তার মায়ের জন্য একটি যোগাসন অনুশীলন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেন। শিক্ষকের কথামতো মিত্রার মা উক্ত আসন অনুশীলন করে শরীর ও মনে এই আসনের সুফল উপলব্ধি করেন।

ক. নমস্কার কিসের প্রতীক ?

খ. নিত্যকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্ভীষ্টকে শিক্ষক মিত্রাকে তার মায়ের সুস্থতার জন্য কোন যোগাসন অনুশীলন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিত্রার মায়ের শরীর ও মনের ওপর উক্ত আসন অনুশীলনের প্রভাব মূল্যায়ন কর।

২. লড়ক-দুর্ধিটনায় কোমর ও গিঠে ভীষণ অঘাত পেয়ে রতনবাবুর পঞ্জি হওয়ার উপক্রম হয়। চিকিৎসায় সুস্থ হলোও তাঁর হেঁচক ও বাঁকা হয়ে যায়। তিনি সোজা হয়ে উঠতে পারেন না এবং কোমরের বাঁকায় কষ্ট পান। আরোগ্যলাভের আশায় তিনি পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্রে যান। চিকিৎসক তাঁকে প্রয়োজনীয় ফিজিও থেরাপি দিয়ে একটি আসন অনুশীলনের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। রতনবাবু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আসনটি নিয়মিত অনুশীলনে সুস্থ হন। তাঁর অনুভূতি শুধু শারীরিকভাবেই আরোগ্য নয় বরং মানসিকভাবেও তিনি এখন সুস্থ।

ক. দেহ ও মনকে নীরোগ ও শান্ত রাখার জন্য নিয়মিত কী করা প্রয়োজন ?

খ. নিত্যকর্মকে গবিত্র্য কর্ম বলা হয় কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. রতনবাবু কোন আসন অনুশীলন করে আরোগ্য লাভ করেন ? উক্ত আসন অনুশীলন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

ঘ. ‘রতনবাবু শুধু শারীরিকভাবেই আরোগ্য নন বরং মানসিকভাবেও তিনি এখন সুস্থ’ – উক্ত আসনের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ঈশ্বর নিরাকার হলেও এ মহাবিশ্বের প্রয়োজনে বিভিন্ন রূপে পৃথিবীতে অবিস্তৃত হয়ে থাকেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ অকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, লাক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, ভগবান বিষ্ণু প্রতিপালন ও রক্ষাকারী দেবতা, শিব ধ্বংসের দেবতা।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে আমরা তিন প্রকার দেব-দেবীর পরিচয় পাই : বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা ও লৌকিক দেবতা।



বৈদিক দেবতা – যেসকল দেবতার নাম বেদে উল্লেখ আছে, তাঁদের বৈদিক দেবতা বলে।

পৌরাণিক দেবতা – যেসকল দেবতার নাম পুরাণে উল্লেখ আছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলে।

লৌকিক দেবতা – বেদে বা পুরাণে উল্লেখ নেই, লৌকিকভাবে পূজিত হন এমন দেবতাদের বলা হয় লৌকিক দেবতা।

আমরা এসকল দেব-দেবীর পূজা করে থাকি। দেব-দেবীর পূজা করলে ঈশ্বর খুশি হন এবং তত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

‘পূজা’ ও ‘পার্বণ’ শব্দ দুটি সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূজা মানে শ্রদ্ধাভাজন। দেব-দেবীকে পুষ্পমাল্য, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে শ্রদ্ধা ভাজন করাকে পূজা বলে অভিহিত করা হয়। আর ‘পার্বণ’ শব্দের অর্থ হলো পূর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দানুষ্ঠান। হিন্দুধর্মের বিবিধবান অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়। একেই বলে পার্বণ। পূজা উপলক্ষে নানারকমের আয়োজন করা হয়। পূজার জন্য নানারকম উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়। যেমন- প্রতিমা নির্মাণ; দেবতার ঘর সাজানো; বিভিন্ন ধরনের ঝাঁদের আয়োজন বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, কঁসি, শঙ্খ ইত্যাদি; ভক্তদের সাথে ভাববিনিময়; কিছুটা বিচিত্রধর্মী ঋগ্বেদাঙ্গাওয়া; বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন; পরিচ্ছন্ন শোশাক-পরিচ্ছন্ন পরিধান ইত্যাদি।

পার্বণ পূজা অনুষ্ঠানকে অধিক অনন্দঘন করে তোলে। ফলে ঈশ্বর ও দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি, একাগ্রতা, গভীর শ্রদ্ধাবোধ, নিজস্বের মধ্যে স্বশ্রুতি ও সংশ্লিষ্ট ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

এ-অধ্যায়ে আমরা পূজার উপকরণ বা উপচার এগুলো ব্যবহারের তাৎপর্য, নারায়ণ, মনসা ও শনিদেবের পরিচয়, পূজা-পদ্ধতি, পুষ্পাঙ্কণ ও প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জানব।

এ-অধ্যায়শেষে আমরা—

- ☐ ● পূজার উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপচার ব্যবহারের তাৎপর্য এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● মনসা দেবীর পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● মনসাপূজার প্রণামমন্ত্র বলতে, লিখতে এবং সরলার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● মনসা দেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● নারায়ণ ও শনিদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● নারায়ণ ও শনিদেবের প্রণাম মন্ত্র বলতে, লিখতে এবং সরলার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● পারিবারিক জীবনে নারায়ণ ও শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● মনসা, নারায়ণ ও শনিপূজার শিক্ষা উপলব্ধি করে শ্রদ্ধাভরে পূজা অর্চনায় উদ্বুদ্ধ হব
- ☐ ● প্রাকৃতিক উপচার সংরক্ষণে যত্নশীল হব
- ☐ ● পূজা পার্বণের জন্য প্রাকৃতিক উপচার সংগ্রহ এবং পূজা-পার্বণের ধর্মীয় নান্দনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করব।

পাঠ ১ ও ২ : পূজা-উপকরণের ধারণা এবং পূজা-উপকরণ ব্যবহারের তাৎপর্য ও সংরক্ষণ

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়। পূজা করার বিভিন্ন রীতি-নীতি রয়েছে, যাকে পূজাবিধি বলা হয়। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা সঠিকভাবে করার জন্য ও পূজার রীতিনীতিসমূহ সঠিকভাবে পালন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সমগ্রীর প্রয়োজন হয়। এসকল পূজাসামগ্রীকে পূজার উপকরণ বা উপচার হিসেবে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূজার রীতিনীতি বা বিধি অনুসারে অতিষ্ঠদেবতা বা দেবীর জন্য সৈবেদ্য সমর্পণ করতে হয়। সৈবেদ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফল, মিষ্টি বা অন্যন্য খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়। এগুলোকে পূজার উপকরণ বা উপচার বলে।

দেব-দেবীর পছন্দ অনুসারে পূজা উপকরণেরও ভিন্নতা রয়েছে। তবে সাধারণভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার জন্য নিম্নবর্ণিত উপকরণসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

১. **বিগ্রহ বা প্রতিমা** : পূজায় সেব-সেবীর বিগ্রহ বা প্রতিমা নির্মাণ করা হয়।

২. **কলস বা মাটির পাত্র** : পূজার উপকরণ হিসেবে প্রথাগত নিয়ম অনুসারে মাটির বা ধাতুর তৈরি কলস ব্যবহার করা হয়। পূজার সময় কলসটি গাছা নদীর জল বা প্রবহমান পরিষ্কার জল দিলে পূর্ণ করা হয়। কলসকে মঙ্গলঘট ও বদা হয়। অর্থাৎ কলস বা ঘট একটি মাহাত্মিক প্রতীক। কলস বা ঘটকে ধরিত্রীমায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং ঐশ্বরিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রতীক হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।



কলসের মুখে অস্ত্রপদ্মের সঞ্চাপন করা হয় এবং তার উপর একটি সবুজ মারিকেল সঞ্চাপন করা হয়। অস্ত্রপদ্ম ও মারিকেল মহাবিশ্বকে নির্দেশ করে। অস্ত্রপদ্মের সাথে সজীবতার সম্পর্ক রয়েছে এবং একে তালোবাসার ও উর্বরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পূর্ব কলস পাঁচটি উপাদানকে নির্দেশ করে। কলসের সবচেয়ে চওড়া অংশ পৃথিবীকে নির্দেশ করে, প্রমারিত কেন্দ্র জলকে নির্দেশ করে, কলসের ঘাড় অগ্নিকে নির্দেশ করে, মুখের খোলা অংশ বায়ুকে নির্দেশ করে কলসের মুখের উপর নারিকেল ও অস্ত্র পদ্মকে আকাশ বা ইথার হিসেবে ধরা হয়।

৩. **প্রদীপ** : পূজার একটি উপকরণ প্রদীপ। প্রদীপ সৃষ্টি অগ্নি সকল অন্ধকারকে দূর করে বলে একে জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। প্রদীপ আমাদের জীবনের আলো ও আত্মাকে নির্দেশ করে।



৪. **শঙ্খ** : শঙ্খ মঙ্গলচক্র পূজা উপকরণ যা সৃষ্টির পবিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করে। সমুদ্রের শঙ্খ ঘড়ির কাঁটার মতো ঘন দিকে আবর্তিত হয়ে সকলের জন্য আশীর্বাদ প্রদান করে। এর সুরেলা ধ্বনি সেন সকলকে জ্ঞানের জগতে, ভক্তির জগতে আহ্বান জানায়-গোমরা এসো, সেবতার কাছে আনত হও, আশুনিবেদন করো।

৫. **ফুলের মালা** : সেব-সেবীদের সম্মানিত ও সন্মিত করার মাহাত্মিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



৬. **অঙ্গল** : সেবভাসের বসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৭. **মুকুট** : মুকুট সেবভাসের উচ্চ সম্মানের প্রতীক।

৮. **পদ-সুশাগরি** : সুশাগরি কঠিন অংশ আমাদের অহমবোধের প্রতীক যা পূজার শেষে সেবতা বা সেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়।

৯. **কর্পূর** : সুগন্ধি কর্পূর পূজায় ব্যবহৃত হয়।

১০. **গজাভল :** দেব-দেবীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য পবিত্র গজের জল ব্যবহার করা হয়। কেননা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে গজের জল পবিত্র। এ-জলে বিভিন্ন ধরনের রোগা পীড়া ভাগ্যে করার ক্ষমতা বিদ্যমান। এ ছাড়াও এ-জল অত্যাধিক চিন্তাভেদনা বৃষ্টি ও বৈয়য়িক সম্মদবৃষ্টির সহায়ক।
১১. **ধূপকাঠি :** ধূপকাঠি আমাদের ইচ্ছাসমূহ নির্দেশ করে যা দেব-দেবীর পূজার সময় বিশেষ পাণ্ডে রেখে প্রজ্জ্বলিত করা হয়।
১২. **ধালা :** ধালায় বিভিন্ন সামগ্রী পূজার উদ্দেশ্যে রাখা হয়।
১৩. **ধূপ :** ধূপ এক ধরনের সুগন্ধবস্তু যোয়া সৃষ্টিকারী পূজা উপকরণ যা আমাদেরকে ধারণ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করে বলে বিবেচনা করা হয়।
১৪. **চন্দন :** চন্দনকাঠ সুগন্ধি। চন্দনকাঠ জলে ঘষে অনুসোপন তৈরি করা হয়। চন্দনের গন্ধ পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টিকরে। এ-কারণেই দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে সচন্দন পুষ্প বা বিলুপত্র নিবেদন করা হয়। চন্দন একটি মজলজনক ও নান্দনিক পূজা-উপকরণ।
১৫. **আবির :** এক ধরনের লাল রঙের গুঁড়া যা দেব-দেবীদের জন্য ব্যবহার করা হয়।
১৬. **চাল :** বহু গুণ পূজা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
১৭. **দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে সৈবেদ্য সমর্পণ :** ফুল, ফল, মিষ্টিজাতীয় বাদ্য ইত্যাদি সৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করা হয় যা দেব-দেবীর কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ করাকে নির্দেশ করে।
১৮. **পঞ্চারতি :** একই সাথে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয় এমন একটি পূজা-উপকরণ।
১৯. **ঘন্টা :** পূজায় ঘন্টা বাজানো হয়। একটি মজলজনক শব্দসৃষ্টিকারী পূজা-উপকরণ।
২০. **হলুদ :** হলুদ পরিপূর্ণ চিন্তাকে নির্দেশ করে এবং মনকে আর্কষণ করে। এ ছাড়াও হলুদ দেবী দুর্গার প্রতীক। হলুদে ভেষজ গুণ রয়েছে।
২১. **পবিত্র সূতা :** যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন হয়।

একক কাজ : পূজার উপচারসমূহের নাম লেখ।

নতুন শব্দ : সমার্থক, বিচিরাৎমী, সম্মীতি, পঞ্চারতি।

পাঠ ৩ ও ৪ : মনসাদেবীর পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

মনসাদেবীর পরিচয়

মনসা সপ্তের দেবী। তিনি সর্পকুলের জননী। তিনি আমাদের সর্পভয় থেকে রক্ষা করেন। তিনি উর্বরতা ও সমৃদ্ধির দেবী হিসেবেও পরিচিত। বাংলাদেশসহ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে মনসা-দেবীর পূজা করা হয়। মনসা লৌকিক দেবী। পরে পৌরাণিক দেবীরূপে পরিণতি হয়েছেন। দেবী মনসা বিশ্বহীন নাগেও পরিচিত। কেননা তিনি সাপের বিশ্ব হরণ করে থাকেন। ব্রাহ্মার উপদেশে স্বর্গে বসিষ্ট সর্পদেবের স্তুতি করেন এবং তাঁর তপস্যার ধারা মন থেকে সেই মন্ত্রের অমিষ্টাত্রী দেবীরূপে মনসার অবির্ভাব ঘটে। মন থেকে সাকার রূপ লাভ করেছেন বলে এর নাম হয়েছে মনসা। পূরণ মতে, তিনি জগৎকার মুনির পত্নী, অজি কের মাতা এবং সাপের রাজা বাসুকির বোন। তাঁর পিতার নাম কশলমুনি এবং মাতার নাম কাদ্রু (Kadru)। তিনি নাগমাতা নামেও পরিচিত।



মনসাদেবীর মূর্তি

আকৃতিগত নিক থেকে মনসাদেবীর চারটি হাত রয়েছে এবং তিনি গৌরবর্ণী। তাঁর আরেক নাম তাই জগদমৌরী। চন্দ্রের মতো সুন্দর এবং প্রসন্ন তাঁর মুখমণ্ডল। অল্প বর্ণের অর্থাৎ জোনের সূঁচের আদ্যের মতো লাল রঙের কাপড় তিনি পরিধান করেন। তিনি সোনার অলংকার পরে থাকেন। কয়েকটা সাপ তাঁকে জড়িয়ে থাকে, মেন তাঁর অলংকার। হাঁস তাঁর বাহন। প্রসন্ন মুখে তিনি হাঁসের ওপর বসে থাকেন। এ ছাড়াও অটটি সাপ তাঁর হাত, মুকুট ও পাদদেশ ঘিরে থাকে।

মনসা-পূজাপদ্ধতি

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার পরের তিথিকে নাগপঞ্চমী তিথি বলে। নাগপঞ্চমী তিথিতে উঠানে নিজ গাছ সঞ্চালন করে তাতে মনসাদেবীর পূজা করা হয়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মনসাদেবীর পূজা করার বিধান রয়েছে। বর্তমানে মনসা মন্দিরে মনসার পূজা করা হয়। পারিবারিক পর্যায়ে পারিবারিক মন্দিরে মনসাদেবীর পূজা করা হয়। এ-পূজা করার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। মনসাপূজা করার জন্য অন্যান্য পূজার মতো সাধারণ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয়। সাধারণভাবে দেবী মনসার পূজাপদ্ধতি হিসেবে পূজার প্রারম্ভে সন্তোষপ্রার্থণ, মনসার প্রতিমা স্থাপন, আচমন, চক্ষুদান প্রভৃতি বিধি অনুসরণ করতে হয়। এ ছাড়াও মনসাপূজার ক্ষেত্রে মনসার ধ্যান, আবাহন মন্ত্র পাঠ এবং পূজামন্ত্রপাঠ করতে হয়। অতঃপর মনসাদেবীকে সুন্দরতর পাঠ করে স্তান করতে হয় এবং অষ্ট নাগমন্ত্র পাঠের মধ্যমে দেবীর পূজা আরম্ভ করতে হয় এবং শেষে পূজাপ্রাণি ও প্রণামমন্ত্রের মাধ্যমে পূজা সমাপন করতে হয়। সবশেষে সাধারণত দেবী প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

পাঠ ৫ ও ৬ : মনসাদেবীর প্রণামমন্ত্র ও মনসাপূজার শিকা ও প্রভাব

মনসাদেবীর প্রণামমন্ত্র

অস্তি কস্য মনোমতী ভগিনী-বসুকৈঃ ধা।

জগৎকারুণ্যেনো পত্নী মনসাদেবী নমোহস্ত্য তে ॥

সরলার্থ

অস্তি ক মূনির মাতা, নাগরাজ বাসুকীর ভগ্নী, জরতকার মূনির পত্নী মনসাদেবীকে প্রণাম করি।

মনসাদেবীর প্রভাব ও গুরুত্ব

মনসাদেবীর পূজা করলে সাপের ভয় থাকে না। মনসাদেবীর মাছাছা নিয়ে অনেক উপাখ্যান রচিত হয়েছে। এসকল উপাখ্যানে মনসাদেবীকে পূজা না করার ভয়ানক পরিণাম এবং পূজা করার সুফল বর্ণিত হয়েছে। মনসাদেবীর পূজার সময় এসকল উপাখ্যান শোনানো হয়। এরূপ উপাখ্যান অলঙ্ঘন অনেক পাদাঙ্গানও রচনা করা হয়েছে। ‘মনসার জন্ম’ এরকম একটি পাদাঙ্গান। এ ছাড়াও মনসাপূজার মাধ্যমে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন সাপ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণের সুযোগ ঘটে। বিশ্বের সাপের প্রকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে সর্পদংশনের ঘটনা কম সংগঠিত হয়ে থাকে। এ-পূজার মূল শিকা হলো সর্পকে বশীভূতকরণের কৌশল আয়ত্ত করা যার মাধ্যমে শত্রুকে সুপথে ফিরিয়ে এনে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

একক কাল : মনসাদেবীর পূজার সুফলগুলো দেখে।

নতুন শব্দ : প্রজ্বলিত, জগদগৌরী, নগপঞ্চমী, কাহ্ন।

পাঠ ৭ ও ৮ : নারায়ণ দেবের পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি

নারায়ণ দেবের পরিচয়

বিশ্বের সৃষ্ট্রনাম অনুসারে ভগবান বিষ্ণুর ২৪৫তম নাম নারায়ণ। হিন্দুধর্ম অনুসারে নারায়ণ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর নামে পরিচিত। নারা শব্দের অর্থ মানুষ এবং অয়ন (Ayana) শব্দের অর্থ আশ্রয়। সুতরাং নারায়ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে সকল জীবের জন্য আশ্রয়স্থল। শ্রীমদভবদগীতা ও পুরাণ অনুসারে দেবতা নারায়ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে অতিহিত করা হয়েছে।

নারায়ণ দেবের বর্ণনা

হিন্দুধর্মগ্রন্থ অনুসারে ভগবান বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। তাঁর চার হাত বিদ্যমান এবং চার হাতে চার ধরনের বস্তু রয়েছে। এক হাতে রয়েছে পদ্ম, একহাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র এবং আর এক হাতে রয়েছে গদা। শ্রীমদভবদগীতা অনুসারে তিনি বিশ্বব্রহ্ম



(Vishvarup)। তাঁর সহস্রবিশীর্ণ নাম দেবী লক্ষ্মী। নারায়ণই বিষ্ণু বা হরি। তিনি এ-বিশ্বের পালনকর্তা। তাঁর বাহন গরুড়।

নারায়ণ পূজার উদ্দেশ্য : ভগবান নারায়ণ সকল জীবের অশ্রয়স্থল। নারায়ণ পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দেবতা নারায়ণের আশীর্বাদ লাভ করা এবং নারায়ণের কৃপায় পারিবারিক সুখ-শান্তি অর্জন করা।

সময়কাল : যে-কোনো সময় বা মাসে নারায়ণ পূজা করা যায়। বৈশাখ মাসে নারায়ণ পূজার প্রচলন অধিক লক্ষ করা যায়।

পূজাপদ্ধতি

প্রতিমাকল্পে, শালগ্রাম শিলারূপে, তন্ত্রপাত্রে বা জলে নারায়ণ পূজা করা হয়। শালগ্রাম শিলা একপ্রকার সামুদ্রিক জীবাশ্ম যা ভারতের গড়কী নদীর তীরে শালগ্রাম নামক গ্রামে পাওয়া যায়। এই জীবাশ্মটি গোলা, কালো রঙের হয়ে থাকে। এই শিলাকে নারায়ণ চক্রও বলা হয়। নারায়ণ পূজায় অন্যান্য পূজার মতোই সাধারণ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয়। তারপর বিশেষভাবে নির্ধারিত মন্ত্রে নারায়ণের পূজা করা হয়। সাধারণত নারায়ণ পূজার জন্য স্নান ঘুসের প্রয়োজন হয়। তুলসীপাতা নারায়ণের প্রিয়।

পাঠ ৯ ও ১০ : নারায়ণের প্রণামমন্ত্র ও নারায়ণ পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

নারায়ণের প্রণাম মন্ত্র

ও নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোত্রাঙ্ঘ্রহিত্যয় চ।

জগন্নিত্যয় কৃণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

সরলার্থ : নারায়ণ ব্রাহ্মণ্যদেব। তিনি কৃষ্ণ, তিনি গোবিন্দ। তিনি পৃথিবী, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতসাধন করেন। তাঁকে বারবার নমস্কার জানাই।

নারায়ণ পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

নারায়ণ পালনের দেবতা। তাই নারায়ণ দেবের কাছ থেকে আমরা আমাদের সন্তানসন্ততি তথা সকল জীবকে দায়িত্বের সঙ্গে পালন করার শিক্ষা পাই। নারায়ণ দেব দুঃখের দমন করেন। আমরাও প্রয়োজনে দুঃখের দমন করব, এ-শিক্ষাও নারায়ণ পূজার মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি।

নারায়ণকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়। তুলসী পবিত্র হয়। মনে শক্তির সঞ্চার হয়। নারায়ণ আমাদের প্রতিপালনকারী দেবতা। তিনি আমাদের দেহের মধ্যে আত্মরূপে বিরাজ করছেন। নারায়ণ পূজার মাধ্যমে ভক্তেরা ভগবান নারায়ণের আশীর্বাদ লাভ করে থাকেন। তাঁর আশীর্বাদ ভক্তদের সৈনন্দিন জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। নারায়ণ পূজার ফলে মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তগণ শক্তির জন্য পরম শ্রুশ্রুতরে ভগবান নারায়ণের উপাসনা করেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

একক কাজ : নারায়ণ পূজার পাঁচটি প্রভাব লেখ।

নতুন শব্দ : শালগ্রাম শিলা, গড়কী, জীবাশ্ম, তন্ত্রপাত্র।

পাঠ ১১ ও ১২ : শনিসেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

শনিসেবের পরিচয়

হিন্দুধর্মে অন্যান্য দেবতার মতো শনিসেবও একজন উপাস্য দেবতা। শনি দেবতা সূর্য ও ছায়ায় পুত্র। তিনি নবগ্রহের অন্যতম। জীবনে চলার ক্ষেত্রে হেসকল বাধাবিপত্তি ঘটে, শনিসেব তা দূর করে থাকেন। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে বাধাবিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শনির পূজা করে থাকেন।



শনিসেবের স্বর্ণনা

শনির গায়ের রং কালো এবং কালো পোশাক পরিহিত। তাঁর হাতে তরবারি, তীর, খড়্গ দেখা যায় এবং কাক তাঁর বাহন।

শনিসেবের পূজা

সময়কাল : শনি দেবতার নাম অনুসারে শনিবারে শনির পূজা করা হয়।

শনি পূজার উদ্দেশ্য : এ-পূজা করার উদ্দেশ্য হলো— শনি দেবতাকে সমুষ্ঠ রাখা, বিভিন্ন ধরনের গ্রাম-শীড়া থেকে মুক্ত থাকা এবং মনে শান্তি বজায় রাখা।

শনিসেবের পূজাপদ্ধতি

সাধারণত পূজা মন্দিরে বা পারিবারিক পর্যায়ে সূর্যোস্তে শনিপূজার আয়োজন করা হয়। পূজা আয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যান্য পূজার মতো সকল ধরনের পবিত্রতা ও বিধি অনুসরণ করা হয়। পারিবারিক পর্যায়ে শনিপূজা আয়োজনের ক্ষেত্রে বাড়ির আঙিনাকে বেছে নেওয়া হয় এবং শনিসেবের পাঁচালি পাড়ে শনিপূজা করা হয়। মন্ত্রপাঠের মাধ্যমেও শনিপূজা করা হয়ে থাকে। সাধারণত গৃহের অভ্যন্তরে শনিপূজা করা হয় না এবং পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে পূজা অনুষ্ঠানে হোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করতে হয়। শনিপূজায় শনির চোগ হিসেবে পাঁচ প্রকারের অতুভিত্তিক ফল এবং পাঁচ বকমের ফুল নিবেদন করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে প্রসাদ হিসেবে ঝিড়ি, দুধ, চিনি, বাতাসা, কলা, গুড়, মিষ্টান্ন ও ময়দার মফার আয়োজন করা হয়। ঝিড়ি পঙ্কু তেলের ক্ষেত্রে মুগের ডাল ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়াও পূজার উপকরণ হিসেবে পান-মুগারি, ময়ুর বাটি, মাঝকলাই, কাশো তিল, বেগুনি বা কালো রঙের ফুলের প্রয়োজন হয়। শনিপূজাশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পাঠ ১৩ ও ১৪ : শনিসেবের পূজার প্রণাম মন্ত্র ও শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

শনিসেবের প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নীলাঞ্জনচরণধার রবিসূত-মহাঃহম্ ।

ছায়ায়া গর্তসমুত্থং তুং নমামি শনৈঃপরম্।

সরলার্থ

তোমার দেহ কৃষ্ণবর্ণ, তুমি সূর্যদেবতার পুত্র, হায়ার গর্ভে তোমার জন্ম, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করা।

শনিদেবতার শিক্ষা ও প্রভাব

শনিদেবের পূজা করলে আমাদের অপদ-বিপদ দূর হয়। আমাদের দায়িত্বহীনতা, অপবিত্রতা ও গাণ্ডের কারণে শনিদেব খুব দুঃখী হন। তখন আমরা কষ্ট পাই। কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের উপলব্ধি ঘটে। আমরা তখন দায়িত্বশীলতা ও পবিত্রতার প্রতি মনোযোগী হই। মা যেমন সন্তানকে গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও সংশোধনের জন্য শাস্তি দেন, তেমনি শনিদেবও কখনও কখনও আমাদের কষ্ট দিয়ে সংশোধন করেন এবং অগ্ন্যের পথ থেকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনেন। তাই প্রতি সপ্তাহে শনিবার শনিপূজা করা হিন্দুদের একটি নিয়মিত ধর্মকৃত্য।

দর্শনীয় কাজ : শনিদেবের পূজায় ব্যবহৃত উপচারের একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নবগ্রহ, পাঁচালি, কৃষ্ণবর্ণ।

অনুশীলনী

সূক্ষ্মস্থান পূরণ কর :

১. সাধারণত গৃহের শনিপূজা করা যায় না।
২. পূজাসামগ্রীকে বা বলে।
৩. ভাগ্যন করাকে পূজা বলে।
৪. শব্দ পূজা উপকরণ।
৫. থেকে সাকর্য হুণ লাভ করেছে বলে এর নাম মনসা।

তান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পার্বণ শব্দের অর্থ	মহাবিশুকে নির্দেশ করে
২. নারায়ণের প্রতিকৃতি	পৃথিবীকে নির্দেশ করে
৩. কলসের সবচেয়ে চওড়া অংশ	শনি দেবতা
৪. অমপাতা ও নারিকেল	উৎসব
৫. সূর্য ও ছায়ার পুত্র	শালগ্রাম শিলা

৩. পূজাবিধি অনুসারে শনিপূজায় অরবীর কত রকমের ফুল ও ফল নিবেদনের প্রয়োজন ছিল ?

- | | |
|--------|---------|
| ক. দুই | খ. তিন |
| গ. চার | ঘ. পাঁচ |

৪. অরবীর মানসিক দৃষ্টির কারণগুলো হলো –

- দায়িত্বহীনতা
- অসম্মতভাবে পূজা সম্পন্ন না করা
- শনিদের দৃষ্টি হতে পারেন এই ভাবনা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

তনুয়ারের বাড়িতে প্রতিবছর মনসাপূজার আয়োজন করা হয়। এ-পূজাকে কেন্দ্র করে এলাকার প্রতি বাড়িতেই চলে উৎসব ও পরিবারিক নানা আয়োজন। পুরোহিত সংকীর্ণ উপচার নিবেদনে পূজাশাখতির এক পর্যায়ে পশুর্লিঙ্গন করেন এবং পূজা সম্পন্ন করেন। বর্লিদানে তনুয়ারের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়, কেন জীবহত্যা, কী তার শিক্ষা? এ-সমাজজীবনে এ-পূজায় শান্তির পথ কী ?

- কেন দেবীকে সর্গকুলের জননী বলা হয় ?
- পূজায় উপচার নিবেদনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- পুরোহিত কীভাবে মনসাপূজা সম্পন্ন করেন ? তোমার পঠিত পূজাবিধির আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- তনুয়ারের মনের প্রশ্নগুলোর সমাধান উক্ত পূজার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

নীতি বা নৈতিকতা ধর্মের অঙ্গ। এবং নীতি-সম্পর্কিত শিক্ষাকে নৈতিক শিক্ষা বলে। যত শিক্ষাই গ্রহণ করা হোক না কেন, যদি নৈতিকতা গড়ে না ওঠে, সে-শিক্ষা মূল্যহীন।

হিন্দুধর্মবিশ্বক গ্রন্থসমূহে উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ-অধ্যায়ে আমরা দেশপ্রেম ও নৈতিক গুণের ধারণা উক্ত বিষয়ে ধর্মীয় উপাখ্যান এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিব।



এ-অধ্যায়শেষে আমরা –

- দেশপ্রেম ও অধ্যবসায় ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারিব
- ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারিব
- উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারিব
- ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারিব
- দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারিব।

পাঠ ১ : দেশপ্রেম

দেশপ্রেম বলতে বোঝায় দেশের প্রতি ভালোবাসা। মানুষ যে-দেশে জন্মগ্রহণ করে, তার মাটি-জল-আলো-বাতাস তার দেহকে গঠন করে, তাকে বেঁচিয়ে রাখে। বড় হয়ে মানুষ তার মাতৃভূমির প্রতি সম্রাণ অনুভব করে। মাতৃভূমির প্রতি এই মমত্ববোধই দেশপ্রেম। দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার নামই দেশপ্রেম। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে— 'জননী জনুভূমি'ত স্বর্গাদপি গরীয়সী।' অর্থাৎ জননী ও জনুভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। তাই তিনি দেশপ্রেমিক, তিনি দেশের স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উপরে স্থান দেন। তিনি সবসময় দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করে থাকেন। দেশের কোনো বিপদে দেশপ্রেমিক কখনো নীরব থাকতে পারেন না। নিজের জীবনের বিনিময়েও তিনি সে-বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশের মঙ্গলের জন্য প্রয়াস হলো নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও বিধা বোধ করেন না। দেশপ্রেম মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন, সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমিক।

পৌরাণিক যুগে জনা, বিদূষা, কাণ্ডবীর্ষার্জুন প্রমুখ দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। একালে এ-মহাদেশে মহাত্মা গান্ধী, জুনিরাম, মাস্টারদাস সূর্যসেন, প্রীতিলতা, রানি রাসমণি, চিত্তরঞ্জন দাস, বাঘা যতীন, রক্ষিক, সাদাম, বরকত, জব্বার, বজলবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান, আহানারা ইমামসহ আরও অনেকের নাম করা যায়, তারা দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁদের অবদান স্বর্ণফরে ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। মানুষ তাঁদের স্মরণ করে, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলাতে চেষ্টা করে।

এক কাজ : তোমার জানা একজন দেশপ্রেমিকের অবদান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : মমত্ববোধ, স্বর্গাদপি, গরীয়সী, বিসর্জন, স্বর্ণফর, প্রদর্শিত।

পাঠ ২ ও ৩ : কাণ্ডবীর্ষার্জুনের দেশপ্রেম

প্রতীনকালে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম কাণ্ডবীর্ষার্জুন। তিনি ছিলেন যেমন কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি বীর ও দেশপ্রেমিক। রাজকর্ষের ক্রান্তি দূর করার জন্য তিনি একবার রাজধানীর বাইরে অবকাশ যাপন করছিলেন।

গুপ্ততরের মুখে এ-খবর পেয়ে লঙ্কার রাজা রাবণ সুযোগ বুঝে তাঁর রাজ্য অক্রমণ করলেন। কাণ্ডবীর্ষার্জুনের এক সেনানায়কের নেতৃত্বে সৈর যুদ্ধ শুরু হলো। এরই মধ্যে সংবাদ পৌঁছানো হলো মহারাজ কাণ্ডবীর্ষার্জুনের কাছে। শূনে মহারাজ ক্রোধে আগুনের মতো ভুলে উঠলেন :

কী ! আমার রাজ্য আক্রান্ত! আমার মাতৃভূমি শত্রুর বিধ্বস্ত নিশুদে কিম্বর্ত্ত ! আমি এখনই যুদ্ধে যাব।

একথা ভেবে রাজা কাণ্ডবীর্ষার্জুন অবকাশ যাপন স্বগত করে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। দল্লণ যুদ্ধ শুরু হলো। একপক্ষ অক্রমণকারী। আরেকপক্ষ আক্রান্ত, কিন্তু দেশপ্রেমে উত্ত্বঙ্গ। পরাজিত হলে দেশ হবে পরবীন। তাই সৈন্যগণ কাণ্ডবীর্ষার্জুনের নেতৃত্বে প্রাণপণ যুদ্ধ করল। অবশেষে জয় হলো কাণ্ডবীর্ষার্জুনের। রাবণ পরাজিত হয়ে বন্দি হলেন কাণ্ডবীর্ষার্জুনের হাতে। স্বর্গে এই বার্তা পৌঁছে গেল। কথ্যটা মহামুনি পুষ্কলে'র কানে গেল। এ-সময় তিনি স্বর্গলোকে ছিলেন। রাবণ পুষ্কলে'র নতি। তাই তাঁর খুব দুঃখ হলো। তিনি স্বর্গ থেকে চলে এলেন কাণ্ডবীর্ষার্জুনের রাজসভায়।



কার্তবীর্যার্জুন মহামুনি পুলস্ত্যতাকে দেখে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বললেন, 'কি সৌভাগ্য! আমার, যেখ না চাইতেই জল'- এই বলে তিনি পুস্তক থেকে সাঁচাওঁ প্রণাম করলেন।

কার্তবীর্যার্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুলস্ত্যমুনি বললেন, 'তুমি দেবতাদের প্রিয়। ব্রাহ্মবন তোমার যশস্কীর্তনে মুগ্ধরিত। রাবণ আমার নাতি। তাকে পরাজিত করে তুমি বন্দি করে কারাগারে প্রবেশ। আমি তার মুক্তি চাই, বৎস।'

কার্তবীর্যার্জুন বললেন, 'রাবণ আমার রাজ্য আক্রমণ করেছিল। আমার দেশশ্রেমিক যোদ্ধারা তাকে প্রতিহত করেছে।'

শুনে পুস্তক য বললেন, 'তোমার গভীর দেশপ্রেম আর বীরত্বের কাছে রাবণ পরাজিত হয়েছে।'

কার্তবীর্যার্জুন বললেন, 'আপনি পরম শ্রেষ্ঠ। আপনি যখন রাবণের মুক্তি চাইলেন, তখন তাকে মুক্তি দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই।'

রাবণ মুক্তি পেলেন।

রাবণ তাঁর অপরাধ স্বীকার করলেন এবং অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পুস্তক য বললেন, 'তোমাদের উভয়ের কল্যাণ হোক।'

পুস্তক যের মাধ্যমে অগ্নিসাক্ষী করে কার্তবীর্যার্জুনের সাথে রাবণের মৈত্রী স্থাপিত হলো। পুস্তক য বিদায় চাইলেন তাঁদের কাছে। কার্তবীর্যার্জুন আর রাবণ সাঁচাওঁ প্রণাম করে বিদায় জানালেন মহামুনি পুস্তক যকে।

পুস্তক য চলে গেলেন স্বর্গে। রাবণ ফিরে গেলেন তাঁর নিজের রাজ্যে।

কার্তবীরার্জুন চেয়ে বহিলেন তাদের গমনপথের দিকে। তাঁর চেয়ে পড়ল শ্যামল প্রান্তর। এই তাঁর দেশ, তাঁর মায়ার রাজ্য। আনন্দে-আবেগে ভরে উঠল কার্তবীরার্জুনের হৃদয়।

উপাখ্যানের শিক্ষা : 'দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বার্থত্যাগ করে যাত্রা যুগ্ম করে, তাঁরা দেশপ্রেমিক।'

দলীয় কাজ : কার্তবীরার্জুনের দেশপ্রেম উপাখ্যানের শিক্ষার প্রায়োগিক নিক চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : কার্তবীরার্জুন, গুপ্তচর, অবকাশ, উল্লুখ, বার্তা, পুন্ড্র, সাইজো।

পাঠ ৪ : সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। দেশপ্রেমে উল্লুখ মানুষ দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থবুদ্ধির উপরে উঠে পনের হিতার্থে কাজ করেন। এটাই তাঁর জীবনের ব্রত। দেশপ্রেমে উল্লুখ হয়ে মানুষ তার ধন-জন এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে বিদ্যাবোধ করেন না। দেশের যখন সংকটকাল উপস্থিত হয়, যখন দেশ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, দেশের স্বাধীনতা হয় বিপর্যস্ত, যখন পরাধীনতা মানুষকে শূচলিত করতে চায়, যখন বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষু দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, তখনই মানুষ দেশপ্রেমের অগ্নিমুখে দীক্ষা নিয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ঝুঁপিয়ে পড়েন এবং দেশের মর্যাদা রক্ষায় অকাতরে জীবন বিসর্জন দেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তাবোধ হলো দেশপ্রেমের প্রধান উৎস। স্বাধীনতার জন্য কত বীরের আত্মবলিদানে স্বদেশের মাটি হয় রক্তে রাঙা। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেশপ্রেমেরই এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। দেশপ্রেমের অগ্নিমুখে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে উল্লুখ করেছিল।

স্বদেশের যে-কোনো সৌরবে দেশপ্রেমিকমাত্রই গর্ববোধ করেন। তেমনি দেশের দুর্দিনে বা বরাদ্দ সময়ে শক্তিত চিত্তে উল্লুখ প্রকাশ করেন এবং নিশ্চেষ্টে আত্মত্যাগ করতেও সূচিত হন না। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নির্ধারিত জীবনকে উৎসর্গ করেন। যুগে যুগে দেশপ্রেমিকেরা দেশের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজাদের জীবন উৎসর্গ করার বিরল দৃষ্টান্ত স্ফূরণ করে গেছেন। হিন্দুধর্ম গ্রন্থে দেশপ্রেমকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শুধু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করাই নয়, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করাও দেশপ্রেম। দেশের সম্পদ রক্ষা করাও দেশপ্রেম। দেশের উন্নতির জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়েও দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে। রাষ্ট্র যাতে সঠিকভাবে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, সেজন্য ব্যাঘ্য নাগরিক হিসেবে দেশপ্রেমিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। নিজের দেশের কল্যাণের জন্যই দক্ষ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। কেবল নিজের বা নিজের পরিবারের স্বার্থ দেখলেই চলে না, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কথাও ভাবতে হয়। সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য সন্যাস চেষ্টা থাকতে হয়। এর নামও দেশপ্রেম। অগণ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম নামক নৈতিক গুণটি অর্জন করতে হয়।

দেশপ্রেম মানুষকে উদার করে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে উল্লুখ করে, আত্মসুখ বিসর্জন দেওয়ার প্রেরণা দান করে। দেশপ্রেম মানুষকে পরিত্যাগ। যার মধ্যে দেশপ্রেম নেই তাকে যথার্থ মানুষ বলা যায় না। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সাধারণত দেশপ্রেমিক হয় না। দেশপ্রেমিক দেশের সম্পদ, দেশের স্বার্থ, দেশের মর্যাদা প্রত্যৃতিক নিজের সম্পদ, নিজের স্বার্থ ও নিজের মর্যাদা বলে মনে করেন। তাই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, দেশের মর্যাদারক্ষায় অত্যাধিকার করতেও গিছা হন না। দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে যুগ্মে শহিদ হলে অকম স্বার্থ লাভ হয়।

পরধীনতা ব্যক্তিকে শুল্কলিত করে রাখে। সমাজের অগ্রগতি তাতে ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে পরধীন ব্যক্তির কোনো ভূমিকা থাকে না। তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং আমরা দেশপ্রেমিক হব এবং দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকব। দেশের জন্য, দেশের মানুষের মজাালের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হব না।

নতুন শব্দ : হিতার্থে, উৎসর্গ, শুল্কলিত, আত্মবলিদান, পিছপা।

পাঠ ৫ : অধ্যবসায়

কোনো লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ যত্নসহকারে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে বারবার চেষ্টা করার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় হচ্ছে কতিপয় পুষের সমষ্টি। চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ঐর্ষ্য, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ইত্যাদি পুষের সমাজে অধ্যবসায় নামক নৈতিক গুণটি গড়ে ওঠে। সংস্করণকে ব্যস্ত বা ব্যুৎসাদানের জন্য কঠোর পরিশ্রম আর ঐর্ষ্যের মধ্য দিয়ে পলিত লোকে পৌছানোর মতোই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ বড় হয়। অসাধ্য সাধন করতে পারে। অধ্যবসায় ধর্মেরও অঙ্গ। ধর্মগ্রন্থে অধ্যবসায়কে একটি বিশেষ চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

হ্যারীজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সর্ববিক। হ্যারীজীবন আর অধ্যবসায় একই সূত্রে গাঁথা। বিদ্যার্জনের পথ কুসুমচরিত্র নয়। অলস, কর্মবিমুখ ও হতাশ শিক্ষার্থী কখনও বিদ্যালয়ে সফলতা অর্জন করতে পারে না। একজন অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থী অল্প মেধাসম্পন্ন হলেও তার গড়ে সাফল্য অর্জন করা কঠিন নয়। কাজেই অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে হতাশ না হয়ে পুনরায় বিগুণ উৎসাহ নিয়ে অধ্যবসয়ে মনোনিবেশ করা উচিত। যে-ব্যক্তি অধ্যবসায়ী নয়, সে জীবনের কোনো সাধারণ কাজেও সফলতা লাভ করতে পারে না। জীবনের সফলতা এবং বিফলতা অনেকাংশে অধ্যবসায়ের উপরই নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে জীবনসংগ্রামে সাফল্যলাভের মূলমন্ত্র হচ্ছে অধ্যবসায়। শূন্য অধ্যবসায়ের বশেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, রবার্ট ব্রুস প্রমুখ মনীষী ভগ্নতে বিখ্যাত হয়েছেন।

তাই আমাদের সকলেরই উচিত অধ্যবসায়ের মতো মহৎ গুণটিকে আয়ত্ত করা।

দলীয় কাজ : অধ্যবসায় গুণটির প্রত্যয় লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : সহিষ্ণুতা, মনোনিবেশ, কুসুমচরিত্র।

পাঠ ৬ : অধ্যবসায়ী একলব্য

অনেককাল আগের কথা। তখন হস্তি নাপুরের কাছে এক গহীর অরণ্য ছিল। সেখানে বাস করতেন নিষাদদের রাজা হিরণ্যবনু। তাঁর পুত্র একলব্য।

তাঁর ইচ্ছে হলো, হস্তিনাপুর নগরে গিয়ে অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অস্ত্র বিদ্যা শিখবেন।

সে-সময়ে হস্তি নগরের রাজা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। সুমিত্রির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহস্রের প্রমুখ পাণ্ডুরোগণ এবং দুর্য়োধন, দূঃশাসনসহ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্রগণকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন দ্রোণাচার্য। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বলা হয় কৌরব আর পাণ্ডুর পুত্রদের বলা হয় পাণ্ডব।

একদিন দ্রোণাচার্য কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। এমন সময় সেখানে একলব্য এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাঁধে ধনুক, হাতে তীর, মাথায় গরুর পালক, পরনে বহুল। তিনি দ্রোণাচার্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, 'গুরুদেব, আমি আপনার নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিখতে চাই।'

দ্রোণাচার্য তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার গরিচয় কী?'

একলব্য বললেন, 'আমি নির্যাস বংশীয়। লোকে আমাদের ব্যাধ বলে। এখন থেকে মূরে অরণ্যে আমার বাস।'

দ্রোণাচার্য বললেন, 'বৎস, এখানে আমি শুধু রাজপুত্রদের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে থাকি। তোমাকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।'

একথা শুনে একলব্য ভীষণভাবে দুঃখিত ও মর্মহিত হলেন। মনের দুঃখে তিনি বনে ফিরে গেলেন। গভীর বনে প্রবেশ করে একলব্য লতা-পাতা দিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করলেন। তারপর তিনি মাটি দিয়ে দ্রোণাচার্যের একটি মূর্তি নির্মাণ করলেন। দ্রোণাচার্যকে মনে মনে গুরু মেনে তাঁর মূর্তির সম্মুখে তিনি অর্হুনিষ তীর-ধনুক নিয়ে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন। কঠোর অধ্যবসায়, নিরন্তর পরিশ্রম আর ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা তিনি ধনুর্বিদ্যার প্রায় সকল প্রকার কলাকৌশল আয়ত্ত করে ফেললেন।

এ-সময়ে একদিন অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য কুরু-পাণ্ডবদের নিয়ে তাঁদের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার পরীক্ষা নিতে গভীর বনে গেলেন। সেখানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। তাঁদের সাথে একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছিল। অপরিচিত কউকে দেখলেই কুকুরটি উচ্চস্বরে যেউমেউ শব্দ করে চিৎকার করত।

কাকতালীয়ভাবে শিবিরের অধ্য মূরেই ছিল একলব্যের সাধনার স্থান। একলব্য গভীর মনোনিবেশে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষায় ব্যস্ত। এমন সময় কুকুরটি সেখানে এসে উচ্চস্বরে যেউমেউ করে চিৎকার করতে লাগল। একলব্যের সাধনা ভেঙে গেল। তিনি সাড়াটি বাণ নিক্ষেপ করে কুকুরটির মুখ বন্দ্য করে দিলেন। সে-অবস্থায় কুকুরটি দ্রোণাচার্যের ছাউনিতে ফিরে গেল। তখন উপস্থিত সকলেই লক্ষ করলেন কুকুরটি আর শব্দ করছে না। সুমিত্রির কুকুরটির মুখ পরীক্ষা করে দেখলেন কেউ বাণ নিক্ষেপ করে কুকুরটিকে হত করে দিয়েছে। তাঁরা সকলেই বিস্মিত হলেন। কুকুরটির পোশ পেছন পেছন তাঁরা গৌড়ে গেলেন একলব্যের কাছে এবং ফিরে এসে তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জ্ঞাপলেন। দ্রোণাচার্যও বিস্মিত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন, ধনুর্বিদ্যার এ-কৌশল তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। অম্বা কুকুরটিকে সেই কৌশলেই আক্রান্ত করা হয়েছে।



তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে হাটনি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একলব্যের কুড়িরের সম্মুখে এসে দেখলেন, এক ব্যাঘ্র যুবক একপ্রমানে অশ্বসায়ের সাথে তীর-ধনুক নিয়ে অনুশীলন করছেন। তাঁর সম্মুখে দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি। দ্রোণাচার্যের উপচিহ্নটি টের পেয়ে একলব্য তাঁর তীর-ধনুক মাটিতে রেখে উঠে এসেন গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে। তাঁকে সন্ধ্যাজে প্রণাম করে একলব্য বললেন, 'গুরুদেব, আমি আপনার শিষ্য। আদেশ করুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি।'

দ্রোণাচার্য তাঁকে বললেন, 'বৎস, তুমি এ-বিদ্যা কোথা থেকে শিখেছ?'

একলব্য অগ্নির বদনে বললেন, 'আমি আপনাকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করে আপনার এই মূর্তি সামনে রেখে আপনার কাছ থেকেই এসকল কলাকৌশল শিক্ষা করেছি নিজের অধ্যবসায় আর নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে।'

দ্রোণাচার্য বিস্মিত হলেন। গাজবেরা বিস্মিত হয়ে বৌনমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কোনো অস্ত্র গুরুর কাছে না শিখে নিজে নিজে গভীর অধ্যবসয়ে এমন অস্ত্র বিদ্যাশিক্ষা সহজ কথা নয়।

উপাখ্যানের শিক্ষা : অধ্যবসায় দ্বারা সামান্য অর্জন করা যায়।

একক কাল : অধ্যবসায়ের শিক্ষা তোমরা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখাও।

নতুন শব্দ : একলব্য, দ্রোণাচার্য, হিরণ্যকশিপু, নিরলস, ত্ত্ব অ।

পাঠ ৭ : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য অধ্যবসায় একটি অবিচ্ছেদ্য নৈতিক গুণ।

ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যবসায় ছাড়া শিক্ষা আশ্রয় হয় না। তাই চরিত্র গঠনে অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মানুষ সমাজবান্ধবভাবে বাস করে। সমাজের প্রতি তার বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজের সকলেই যদি স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাহলে সমাজে ও রাষ্ট্রে কোনো হানাহানি থাকবে না, থাকবে না কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। কিন্তু মুখে বললেই নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয় না। এর জন্য চাই কাজের প্রতি একাগ্রতা, ঠেং, দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া। আর এ-গুণাবলির সমন্বয়ে যে বিশেষ নৈতিক গুণ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় তাকে বলে অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ই মানুষকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সাহায্য করে। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ অনেক অসুখ সাধন করেছে। অধ্যবসায় ছাড়া কেউ কখনো উন্নতি করতে পারে না, কোনো জাতি তার কলিকাতা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

সভ্যতার শিখরে অধিষ্ঠিত আজকের বিশ্ব মানুষের সুদীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়ের পরিণতি। বর্তমান সভ্যতার সাগৌরব ইতিহাসে নিরন্তর অধ্যবসায়ের ইতিহাস। মনীষীগণ সারা জীবন সাধনা করে মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। মানুষের অধ্যবসায় না থাকলে সভ্যতার অগ্রগতি হত না।

অধ্যবসায়ের বর্ধক কর্মকর্তিতার জন্যই জীবনের পথে সকল বাধা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের জীবনে যে চিরায়ত সাদ্রাশী শক্তি লিখিত আছে, তার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়ই মানুষকে করে তোলে সাদ্রাশী, উদ্যোগী, আর কর্তব্যপরায়ণ। নিজের অসহায়ত্ব উপেক্ষা করে অধ্যবসায়ের প্রয়োগে মানুষ হয় স্বনির্ভর।

অধ্যবসায় একটি মহৎ গুণ। জাতীয় জীবন মর্যাদাবান হয়ে ওঠে অধ্যবসায়ের এই মহৎ গুণে। জাতির প্রতিটি মানুষ যদি প্রকৃত অধ্যবসায়ী হয়ে ওঠে তাহলে সে-জাতি অবশ্যই সুনাম ও গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠবে।

যে-জাতি যত বেশি অধ্যবসায়ী সে-জাতি তত বেশি উন্নত। রাষ্ট্রীয় জীবনে সৌর্য ও সাফল্য আনয়নের জন্য রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে অধ্যবসায়ী হতে হয়। যেসকল রাষ্ট্রনায়ক, ধর্মসংস্কারক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক জীবনে সাফল্য লাভ করেছেন তাঁরা সবলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী।

শুধু নিজের জীবনে সাফল্য লাভ করলেই চলবে না। ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা অতিক্রম করে জাতীয় জীবনকে মহিমাময় করে তোলার জন্যও অবশরত সাধনা করে যেতে হবে। তাই সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনকে বিশৃঙ্খল্য গৌরবজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের সকলকেই অধ্যবসায়ী হতে হবে। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দলীয় কাজ : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের প্রভাব চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : অবিচ্ছেদ্য, উৎকর্ষ, চিরায়ত, পরধীনতা, ধর্মসংস্কারক, মহিমাময়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. জননী ও জন্মভূমি চেয়েও বড়।
২. আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সাধারণত হয় না।
৩. কার্তবীর্যার্জুন একবার রাজধানীর বাইরে যাপন করছিলেন।
৪. অধাবসায় হচ্ছে কতিপয় সমষ্টি।
৫. একলব্যের ইচ্ছে হলো কাছ থেকে অস্ত্র বিদ্যা শেখার।

তান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. স্বদেশের গৌরবে দেশশ্রেমিক মাত্রাই	একই সূত্রে গাঁথা
২. চন্দ্রবংশীয় এক রাজা	সভ্যতার অগ্রগতি হতো না
৩. ছাত্রজীবন আর অধাবসায়	রাজ্য অক্রেমণ করলেন
৪. অধাবসায় না থাকলে	গর্হবোধ করে
	কার্তবীর্যার্জুন

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. দেশশ্রেম কীভাবে প্রকাশ পায় ? দুইটিসহ ব্যাখ্যা কর।
২. 'দেশশ্রেম একটি মহৎ গুণ' — ব্যাখ্যা কর।
৩. একলব্য কীভাবে ধনুর্বিদ্যা অর্জন করলেন ? ব্যাখ্যা কর।
৪. একলব্যের উপাখ্যানটি পড়ে তুমি কী শিক্ষা পেলো ? ব্যাখ্যা কর।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কার্তবীর্যার্জুনের দেশশ্রেম মূল্যায়ন কর।
২. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশশ্রেমের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
৩. 'জীবনে সাক্ষ্যলাভের মূলমন্ত্র অধাবসায়' — উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
৪. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধাবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. রাবণ কোন মুনির নতি ?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. কাশ্যপ | খ. পুষ্কত |
| গ. চাবন | ঘ. দুরীসা |

২. নিখাদদের রাজ্য ছিলেন কে ?

- | | |
|--------------|----------------|
| ক. হিরণ্যাক | খ. হিরণ্যকশিপু |
| গ. হিরণ্যবদু | ঘ. হিরণ্যমদু |

৩. দেশশ্রেম বলতে বোঝায় —

- মাতৃভূমির প্রতি সম্বন্ধবোধ
- ব্যক্তিস্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া
- জাতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্যামল ১৯৭১ সনে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। যখন ২৫শে মার্চ কালরতে পাক হানাদার বাহিনী নিরপরাধ দুহৃত মানুষের উপর অগ্নিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যা করে তখন তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু অধীন হওয়ার মাসখানেক পরেই এক সম্মুখযুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

৪. শ্যামলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন নৈতিক গুণটি ফুটে উঠেছে ?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. দয়া | খ. সততা |
| গ. দেশশ্রেম | ঘ. অধ্যবসায় |

৫. শ্যামলের অত্মত্যাগের মর্মার্থ হলো —

- অদেশকে ভালোবাসা
- মাতৃভূমির প্রতি সম্বন্ধবোধ
- পরবীনতার গ্রামি থেকে মুক্তিলাভ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সুপ্রিয়া বারবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। একদিন সে তার বাম্পরীয় সাথে অলাপ প্রসঙ্গে তার হতাশার কথা ব্যক্ত করে। বাম্পরী তাকে পরামর্শের ছলে বলে, 'একবার না পারিলে দেখ শতবার।' কথাটি সুপ্রিয়ার মনে গভীর দাগ কাটে এবং সে সবকিছু ছুঁলে পূর্বোদ্যমে পড়ালেখা করতে থাকে। এ-বছর সে পরীক্ষায় পাশ করে। এ-সফলতায় তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

ক. দূতরাষ্ট্রের পুত্রদের কী বলা হয় ?

খ. মহামুনি পুন্ড্র I স্বর্গ থেকে নেমে এলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. বাম্পরীর পরামর্শ কেন সুপ্রিয়ার মনে গভীর দাগ কাটে তা তোমার পঠিত নৈতিক শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রিয়ার সাধনার প্রভাব পঠিত বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায় আদর্শ জীবনচরিত

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ জন্মেছিলেন, যারা অজীবন সেনের উপকার করে গেছেন। নিজের কথা ভাবেননি। তাঁদের কোনো লোভ-মোহ ছিল না। পরোপকারই ছিল তাঁদের একমাত্র ভাবনা। জগতের কল্যাণ করাই ছিল তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁরাই হলেন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী। তাঁদের জীবনীই হচ্ছে আদর্শ জীবনচরিত। তাঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়তে পারি। আমরা ঘট ও সপ্তম শ্রেণিতে এমন বেশ কয়েকজন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী সম্পর্কে জেনেছি। এ-অধ্যায়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর নিগমানন্দ, ঠাকুর অনুকূচানন্দ, মা আনন্দময়ী, শ্রীল ভক্তিবিনোদস্বামী প্রভৃতিদের জীবনী সম্পর্কে জানব এবং নৈতিকতা গঠনে তাঁদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।



এ-অধ্যায়শেষে আমরা —

- নৈতিকতা গঠনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-পরবর্তীকালের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিতের আলোকে তাঁর শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে ঠাকুর নিগমানন্দের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে ঠাকুর অনুকূচানন্দের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে মা আনন্দময়ীর জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীল ভক্তিবিনোদস্বামী প্রভৃতিদের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১, ২ ও ৩ : শ্রীকৃষ্ণ

আমরা যষ্ঠ শ্রেণিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও শৈশবকালের কথা জেনেছি। সপ্তম শ্রেণিতে জেনেছি তাঁর বালাকালের কথা। এখন আমরা জীবন তাঁর কৈশোর থেকে শুরু করে দেখে জীবন পর্বত কর্মকাণ্ডের কথা।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন :

ধর্মো গ্লানি, অধর্মো হয় যবে বাড়।
হেনকালে জন্ম যের জান তত্ত্বসারা।
দুষ্টির বিনাশ আর সাধুর রক্ষণে।
যুগে যুগে জন্মি আমি ধর্মসংরক্ষণনে (৪/৭-৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয়, অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে, তখন ধর্ম সংরক্ষণনের জন্য এবং দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে এবং বালাকালে তিনি দুষ্টিদের দমন করেছেন এবং শিষ্টদের রক্ষা করেছেন। সারা জীবনই তিনি একাজ করেছেন। আমরা এখন শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর থেকে পরবর্তী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হব।



কলোবধ

কলা ছিলেন মথুরার রাজা। ত্রীযণ অত্যাচারী একজন মানুষ। নিজের পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে তিনি রাজ্য দখল করেন। কৃষ্ণ তাঁর হস্তা— এই ঈশবাবী শ্রুনে শিশুকাল থেকেই তিনি কৃষ্ণকে মারার বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। তাই বলে তিনি বলে ছিলেন না। একবার কৌশলে তাঁকে মারার পরিকল্পনা করলেন। মথুরায়শে আমন্ত্রণ জানাণের জন্য তিনি অক্রমকে পর্যালোচনা কুছো কাছে। কৃষ্ণ-বলরাম তখন বৃন্দাবনে। অত্র গিয়ে কংসের দুর্ভাবসিদ্ধির কথা বলে দিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় এসেন। তাঁদের হাতে অনেক বোম্বা মারা গেল। তা দেখে কংস কিন্তু হলো গেলেন। তিনি কৃষ্ণকে মারার জন্য হুম্বক্রেটে আসামাত্রই কৃষ্ণ লাফ দিয়ে তাঁর রাখে উঠলেন। ফল করে মাটিতে ফেল কংসকে হত্যা করেন। তারপর উগ্রসেন, দেবকী, বৃন্দাবন প্রমুখকে মুক্ত করেন। উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করেন। মা-বাবার সঙ্গে কৃষ্ণ, বলরামও মথুরায় থেকে যান। মথুরায় শান্তি ফিরে আসে।

জরাসন্ধ বধ

জরাসন্ধ ছিলেন মগধের রাজা এবং কংসের শুল্লুর। তিনিও ত্রীযণ অত্যাচারী ছিলেন। কংসের মৃত্যুর খবর শ্রুনে তিনি ত্রীযণ রেগে যান। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি মথুরা অক্রমণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। কৃষ্ণ তাঁকে ক্রমা করে মেন। এতে জরাসন্ধ লজ্জিত হন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে যায়। তাই কৃষ্ণকে মারার জন্য তিনি পুরুর সাতবার মথুরা অক্রমণ করেন। কৃষ্ণ তাঁর পরও তাঁকে মারেননি। কিন্তু তিনি এক বিরাট অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছিলেন। বৃন্দাবনের পুষ্করী অন্য তিনি একশো নরবলি সেবনে বলে স্থির করেছিলেন। এ-উদ্দেশ্যে তিনি ৮৬ জন রাজাকে বন্দি করে রেখেছিলেন। আর ১৪ জন হলোই তিনি তাঁর অত্যাচারী কাজ সম্পন্ন করবেন। এ-খবর কৃষ্ণ জ্ঞানতে পেরে দ্বিতীয় পাণ্ডব জীমের সাহায্যে তাঁকে বধ করেন। ফলে একশো জন রাজার প্রাণ বেঁচে যায়।

শিশুশাল বব

শিশুশাল ছিলেন ওসিরায়েলের রাজা। কৃষকরা অতীত। পিসাতুতো ভাই। কিন্তু তাঁর অত্যাচারী। তাই শিশুশালের মা কৃষকে অনুপ্রাণিত করে বলেছিলেন — বাবা, তুমি ওর একশটি অপরাধ কমা করো। কৃষক তা করেছিলেন। গুরুজনের কথা রেখেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব যজ্ঞে কৃষক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ায় ইর্যাদিত শিশুশাল তাঁর মিন্দা শুরু করেন। পাতকদেরও গালাগাল করেন। যুদ্ধের হুমকি দেন। কৃষক তখন তাঁর সুদর্শন চক্রে খাটা তাঁকে হত্যা করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা

যুতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ভাই। যুতরাষ্ট্র অন্যাক্ষ। তাই ছোট ভাই পাণ্ডু হস্তি নগরের রাজা হন। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে। যুধিষ্ঠির বড়। তাঁদের বলা হয় পাঁচব। যুতরাষ্ট্রের একশত ছেলে। বড় দুর্য়োধন। তাঁদের বলা হয় কৌরব। কৌরবরা ছিলেন অসংখ্য এবং দুর্জয়। আর পাঁচবরা ছিলেন সংখ্য ও সদাচারী।

পাণ্ডুর যুতরাষ্ট্রের রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্য়োধন তা মানলেন না। তাই যুতরাষ্ট্র দুই পক্ষের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। পাণ্ডবদের রাজধানী হলো ইন্দ্রপ্রস্থ। কিন্তু দুর্য়োধন তাতে খুশি নন। তাঁর পুরো রাজ্যটাই চাই। তাই তিনি একদিন যুধিষ্ঠিরকে পশা খেলায় আহ্বান করেন। মনে তাঁর দুর্বিসম্বন্ধ। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির হেরে যান। খেলার শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা তেরো বছরের জন্য বনে যান। বনবাসশেষে ঘিরে এসে রাজ্য দাবি করেন। কিন্তু দুর্য়োধন বললেন, বিনা যুদ্ধে তিনি রাজ্য দেবেন না। কৃষক তখন যুদ্ধ ঠেকানোর জন্য দুর্য়োধনের কাছে যান। অনেক আলোচনা করেন। কিন্তু দুর্য়োধন কোনো কথাই শুনলেন না। অগত্যা কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। কৃষক পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়। কৌরবদের সবাই নিহত হন। যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে।



অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই পক্ষ যুদ্ধোন্মুখ। কৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি। তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি। অর্জুন বিপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে কৃষ্ণকে বললেন যুদ্ধ করবেন না। আত্মীয়দের হত্যা করে তিনি রাজ্য চান না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, ‘তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। তা না হলে তার অধর্ম হয়। অশ্রবণ হয়। তা ছাড়া আত্মার মৃত্যু সেই। দেহান্তর ঘটে মাত্র। তুমি যাদের দেখে মার্য্য করছ, তারা নিজেদের দেখে মৃত্যুকে বরণ করে আছে। তুমি উপলব্ধি মাত্র। কাজেই যুদ্ধ করে তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর। যার যা কর্তব্য তা পালন করা ধর্মের অঙ্গ।’ কৃষ্ণ একথা বলার পর অর্জুনের মোহভঞ্জন হয় এবং তিনি যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অন্যায়ের পরাজয় ঘটে, ন্যায়ের জয় হয়। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ হারবার দুইটিকে দমন করে শিষ্টের পালন করেছেন এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন।

দ্বিতীয় কাজ : দুইটির সমনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবদান লিখে একটি তালিকা তৈরি কর।

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু বাসদেয়

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল। সুদামা নামে তাঁর এক সহপাঠী ছিলেন। একই গুরুর নিকট তাঁরা পড়াশোনা করেছেন। সুদামা খুবই গরিব। তবে প্রসুখি। তাঁর কোনো গোষ্ঠ-দালসা নেই। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ এখন দারকার রাজা। তদুপরি স্বয়ং ভগবান হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র।

একদিন সুদামার জ্বী তাঁকে বললেন, ‘তোমার বন্ধু কৃষ্ণ দারকার রাজা। তাঁর কাছে গেলে হয়তো কিছু অর্থলাভ্য পাওয়া যেত। তাতে আমাদের অভাব অনেকটা দূরত।’ সুদামা অর্থের গোষ্ঠে নয়, অনেক দিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে এই ভেবে যেতে রাজি হলেন। তিনি একদিন সত্যি সত্যিই দারকার রওনা হলেন। যাওয়ার সময় তাঁর জ্বী কৃষ্ণকে উপহার দেওয়ার জন্য কিছু ডিড়র বৃন্দ সুদামার উত্তরীয় বস্ত্রে বেঁধে দিলেন।

সুদামা দারকার পৌছলেন। তাঁকে দেখামাত্র কৃষ্ণ দৌড়ে এসে ভড়িয়ে ধরলেন। কৃষ্ণের জ্বী বুজিলী তাঁকে বিশেষভাবে আদর-অপ্যায়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ‘বন্ধু, আমার জন্য কী এনেছ?’ সুদামা তখন সেই ডিড়র বৃন্দ বের করে দিলেন। কৃষ্ণ পরম তৃপ্তিতে বেগলেন। তারপর তাঁরা অনেকক্ষণ গল্প করলেন। কিন্তু সুদামা একবারও অর্থের কথা বললেন না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুর বেশদুবা দেখে সবই বুঝতে পারলেন। তাই তিনি ঐশীল্যে সুদামার বাড়ির অবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন। সুদামা ফিরে গিয়ে দেখেন তাঁর কুঁড়েঘরের ভায়েদায় বিশাল আটালিকা। ঘরে ধনসম্পদের অভাব নেই। কিন্তু তিনি অগের মতোই সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং ব্রহ্মের উপাসনা করতেন।

এক কাজ : তোমার জন্য বন্ধু প্রীতির কোনো ঘটনা সম্পর্কে লেখ।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

ভগবান যে-উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অবতাররূপে জন্ম নিয়েছিলেন, তা সম্পন্ন হয়েছে। দুইটিকে দমন করা হয়েছে। সমাজে ধর্ম ও শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। তাই এবার তাঁর বৈকুণ্ঠে যাবার পালা। বলরাম ইতোমধ্যে ধ্যানবোমে দেহত্যাগ করেছেন।

কৃষ্ণ তাই বনে প্রবেশ করে একটি অশুষ্ক বৃক্ষের নিচে বসে আছেন। দূর থেকে জনা নামে এক ব্যাধ তাঁকে হরিণ মনে করে শর নিক্ষেপ করে। শরটি কৃষ্ণের পায়ে লাগে। এই শরাঘাতেই কৃষ্ণ ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, অনায়াস ও অনভ্যাস এক সময় প্রদূষিত হয়েই। সমাজে দুষ্কর্মের ঠাঁই নেই। ভালবাসাও তাদের ক্ষমা করেন না। ভগবান ধনী-গরিব সকলকেই সমানভাবে ভালোবাসেন। ঘর ছাড়া কর্তব্য আর কী ধর্মের অঙ্গ। অতএব, আমরা এই শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে কাজে লাগাব।

নতুন শব্দ : গ্রামি, অহু, স্মৃতি, অতীত, রাজসূয়, ইন্দুপুষ্ণ, ঐশীবল, অন্তর্ধান।

পাঠ ৪ ও ৫ : শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার অন্তর্গত সাফলিডাঙা একটি গ্রাম। এই গ্রামই জন্মস্থান করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। বাংলা ১২১৮ সনের (১৮১১ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসে। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতার নাম যশোমন্ত ঠাকুর এবং মাতা অনুপূর্ণা দেবী। যশোমন্ত ছিলেন মৈথিলী ব্রাহ্মণ এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। হরিচাঁদ যশোমন্তের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর অপর তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে বৈষ্ণবদাস, গৌরীদাস ও অধুপদাস। এঁরা সবাই ছিলেন বৈষ্ণব। হরিচাঁদ ছিলেন খুবই মেধাবী। কিন্তু বিদ্যালয়ের গভীবিশ্ব পাঠ তাঁর ভালো লাগেনি। তাই মাত্র কয়েক মাস গিয়ে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। মিশে যান রাখাল কল্লুর সঙ্গে। তাদের সঙ্গে গোচারণ করেন। খেলাধুলা করেন। কখনো- বা গান করেন। তাঁর গানের গলা ছিল খুবই মধুর। তাই তাঁর গান, ভজন, কীর্তন শুনলে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁর চেহারাও ছিল খুবই সুন্দর। বাবহার ছিল অমায়িক। এসব কারণে সবাই তাঁকে পছন্দ করত। রাখাল কল্লুরা তাঁকে বলত 'রাখাল রাজা'।

হরিচাঁদ ঠাকুর জেটিবেলা থেকেই ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-বিষয়টি তাঁর মধ্যে আরও প্রকট হয়। তিনি ক্রমশঃ ধর্মের দিকে চলে যান। তবে তিনি নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার করেননি। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরিনাম প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।' এই নামসংকীর্তনই হচ্ছে তাঁর সাধন-ভজনের পথ। তিনি এই হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। এজন্য তাঁর এই সাধনপথের নাম হয় মতুয়া। আর তাঁর অনুসারীদের বলা হয় 'মতুয়া সম্প্রদায়'।



মতুয়াবাদের মূল কথা হলো মনুষ্যত্ব অর্জন, আত্মোন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণসাধন। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা — এই তিনটি

স্ত্র মেন্দ্র উপর মতুয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত। সাধনার লক্ষ্য সত্তদর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এজন্য চাই প্রেম। প্রেমের পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। পবিত্র দেহ-মনে প্রেমের উদয় হয়। তখন ভক্তের অন্তরে প্রেমময় হরি জাগ্রত হন।

হরিচাঁদ ঠাকুর হরিনামের মাধ্যমে সামাজিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করেন। তিনি বলতেন, 'দল নাই যার, বল নাই তার।' এর ফলে মতুয়াবাদ এক বিরাট আন্দোলনে পরিণত হয় এবং মতুয়া সম্প্রদায় ছড়িয়ে পড়ে বাংলার সর্বত্র।

ঠাকুর বলতেন, ধর্মচর্চা জন্ম সংসার ত্যাগ করতে হয় না। সংসারে থেকে সংসারের কাজ করেও ধর্মচর্চা করা যায়। তাঁর নির্দেশই ছিল, 'হাতে কাম, মুখে নাম।' তিনি নিজের সংসারী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। পুত্ররা হলেন গুরুচরণ ও উমাচরণ। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর গুরুচরণই গুরুচাঁদ নামে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে পূজিত হন। মতুয়া সম্প্রদায় হরিচাঁদ ঠাকুরকে বিকুর অবতার হিসেবে জ্ঞান করেন। তাই তাঁরা বলেন:

রাম হরি কুড় হরি হরি গোরচাঁদ।

সর্ব হরি মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ ॥

ঠাকুরের মতুয়াবাদে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ এসবে কোনো ভেদ নেই। যে-কেউ হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

মতুয়া সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে। সাকলিতারা গ্রামের পাশে। সেখানে প্রধান হরিমন্দির অবস্থিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিমন্দির আছে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের মতুকা ত্রয়োদশী তিথিতে ওড়াকান্দিতে মহাবরুণি স্নান অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন পর্যন্ত সেলা বসে। হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে ঐ স্নান ও মেলায়। তাঁরা হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বাংলা ১২৮৪ সনের (১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) ২৩শে ফাল্গুন ৬৬ বছর বয়সে হরিচাঁদ ঠাকুর ইহলীলা সংবরণ করেন।

ঠাকুরের জীবন ও আদর্শ নিয়ে কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার রচনা করেছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিমন্দির আছে। সেখানে মতুয়াসহ ভক্তরা নিয়মিত নামকীর্তন করেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ঠাকুরের কয়েকটি মূল্যবান বাণী হলো:

১. হরি ধ্যান হরি জ্ঞান হরি নাম সার।

প্রেমতে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যারা।

২. জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।

ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া অষ্টা।

৩. গৃহেতে থাকিয়া যার হয় কাবোন্দয়।

সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়।

৪. গৃহকর্ম গৃহধর্ম করিবে সকল।

হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবলা

গার্হস্থ্য তোমার ধর্ম অতি সনাতন।

মুখের দমন আর শিষ্টের পালন।

হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর অনুসারীদের বাসোটি উপদেশ দিয়েছেন, যেগুলো 'ছাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এই আজ্ঞাগুলো সবার জন্যই শিক্ষণীয়। আজ্ঞাগুলো হলো : (১) সদা সত্য কথা বলবে। (২) পিতা-মাতাকে দেবতায় মনে ভক্তি করবে। (৩) নারীকে মাতৃভাষ্য করবে। (৪) জগৎকে প্রেম করবে। (৫) সকল ধর্মে উদার থাকবে। (৬) জাতিভেদ করবে না। (৭) হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। (৮) প্রভুকে প্রার্থনা করবে। (৯) ঈশ্বরে আত্মদান করবে। (১০) বহিরঞ্জে সাধু সাজবে না। (১১) যড়রিপু বশে রাখবে। (১২) হাতে কাম, মুখে নাম করবে।

দলীয় কাজ : হরিচাঁদ ঠাকুরের উপদেশগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : অহোব্রাতি, মহুয়, মহাবাহুবি, বহিরঞ্জে, যড়রিপু।

পাঠ ৬, ৭ ও ৮ : শ্রীমতী বিবেকানন্দ

শ্রীমতী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিদ্যনাথ দত্ত এবং মাতা জুবনেশ্বরী দেবী। পিতা বিদ্যনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা উকিল। বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন না। মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন তিনি বেঁচেছিলেন। এই অল্প সময়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য তিনি যে-অবদান রেখে গেছেন, তা অসংখ্য। চিরদিন মানুষ তাঁর এই অবদানের কথা স্মরণ করবে।

নরেন্দ্রনাথ খুব মেধাবী ছিলেন। মকুল-কলেজের পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন। তিন বিএ-ও পাশ করেছেন। অতীত ও দর্শন বিষয়ে তাঁর ছিল অসাধারণ জ্ঞান।



এ-সময়ে নরেন্দ্রনাথের মনে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। ঈশ্বর কি আছে? তাঁকে কি দেখা যায়? এ-ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই তাঁর মনে আসে। তিনি অনেককে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসও করেছেন। কিন্তু কারো উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এমন সময় একদিন তাঁর দেখা হয় কালীর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ

তখন দক্ষিণেশ্বর কাশীবাড়িতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন চলে যান সেখানে। রামকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, “অপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?” রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, “হ্যাঁ, দেখেছি; যেমন তাকে দেখছি। চাইলে তাকেও দেখাতে পারি।”

এই সাদাসিধে সবক শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তাঁর প্রতি কেমন যেন একটা ভক্তির ভাব জাগে ওঠে। তাই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাত্রায়াত্র শুরুর করেন। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাগোণে মন্ত্রে দীক্ষা নেন। নরেন্দ্রনাথ হল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুরুর স্বামীজী বোলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করেছেন বাটে, কিন্তু ভারতবর্ষ এবং তার মানুষকে তাগ করেননি। তিনি নিজের চোখে দেখতে চাইলেন ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা। তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। সোকেব বাড়ি বাড়ি গেলেন। দেখলেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। দেশবাসীর এই হীন অবস্থা দেখে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। তিনি এই অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর দারিদ্র্যের কারণ জানতে চাইলেন। কীভাবে এসব থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভারতের জীবনীশক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে সেব্যতাজ্ঞানে মানুষের সেবা। এই ধর্মমন্ত্রে ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই ভারতের উন্নতি হবে।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান। সেখানে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার শুরুতে তিনি উপস্থিত সকলকে ‘ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ’ বলে সম্বোধন করেন। আমরা কল্পেই প্রথাগতভাবে ‘ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ’ বলে। কিন্তু বিবেকানন্দের মুখে এই নতুন সম্বোধন শুনে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হন। অজানা অজানা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে appন করে নেওয়ার মানসিকতা দেখে তাঁরা বিস্মিত হন। তারপর বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীলম্ব যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক— ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিশাশ নয়, পরস্পরের তাবদ্রূপণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।’ বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই অত্যন্ত মুগ্ধ হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর আট মাস।

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অমন্ত্রণ আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্তদর্শন সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। তারপর যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ান এবং বক্তৃতা দেন। তিনি বেদান্তদর্শনের প্রকৃত সত্য তুলে ধরেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন যে, হিন্দুধর্ম কেবল মূর্তির পূজা করে না, সকল দেবতার পূজার মধ্য দিয়ে এক ঈশ্বরেরই অরাধনা করে। তাঁর বক্তৃতা থেকে পাশ্চাত্যের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ মোল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উল্লসিত হন যে, নিজের জন্মশ্রুতি অস্বাভাবিক হোতে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় তগিনী নির্বেদিতা।

প্রায় চার বছর পৃথিবী ভ্রমণ করে বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফেরেন। দেশের মানুষ তাঁকে মহা সম্মানের গ্রহণ করে। বিশাল সন্মেলনা দেয়। সন্মেলনা অনুষ্ঠানে তিনি দেশের মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াতে বলেন। সমগ্র কুসংস্কার পরিভ্রাণ করতে বলেন। সবাইকে বিত্তেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম।

দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।

বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। পরোপকারই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। সং হওয়া আর সং কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। আহুবিদ্যাস ও ঈশুরে বিশ্বাস— এ দুটি জিনিসই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

বিবেকানন্দ যুবকদের আগে শরীর গঠন করতে বলতেন। তারপর ধর্মচর্চা। কারণ দুর্বল শরীরে ধর্মচর্চা হয় না। কোনো কাজই হয় না। এজন্য তাদের গীতা পড়ার আগে যুটবল খেলতে হবে। তাতে শরীর গঠিত হবে। তখন গীতা আরও ভালো বোঝা যাবে।

বিবেকানন্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো— খলিপেটে ধর্ম হয় না। তাই সবার আগে মানুষের দরিদ্রতা মোচড়ে হবে। ঈশ্বরসেবার আগে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবা করতে হবে। জীবসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হবে। তাই তিনি জোর দিয়ে বলেছেন :

বহুবংশে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা ঝুঁজিছ ঈশ্বর ?

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বিবেকানন্দের কাছে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ ছিল না। অস্পৃশ্যতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। একবার এক পতিতা গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর কাশীমন্দিরে মাতৃদর্শনে। এতে কয়েকজন জন্মলোক আপত্তি তোলেন। একজন শিষ্য একথা বিবেকানন্দকে জানান। তিনি বলেন, মাতৃদর্শনে সকলেরই অধিকার আছে। বরং পতিতাদেরই বেশি আসা দরকার। উন্মাদ পণ্ডার জন্য। এতে যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে তিনি এখানে না আসতে পারেন।

বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য একটি মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলেুড়ে গজার পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি বেলেুড় মঠ নামে পরিচিত।

গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনও প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। এসবের প্রধান কেন্দ্র বেলেুড় মঠ। বাংলাদেশে হেলব মঠ ও মিশন রয়েছে, সেসবের প্রধান কেন্দ্র ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। পৃথিবীব্যাপী এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে শতশত মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, অপৎকালীন সাহায্যপ্রদান ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের সেবার্থে কোনো জাতিভেদ বা ধর্মভেদ ছিল না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সেবা প্রদান করতেন। একবার কলকাতায় প্রচুর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে অশ্রুতকেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেখানে কয়েকজন মুসলমান বালক এসেছিল থাকার জন্য। এদের কী করা হবে জানতে চাইলে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মুসলমান বালকেরা অবশ্যই থাকবে। খুদু তাই নয়, তাদের ষাওয়াওজা এবং ধর্মচর্চার ব্যতী কোনো বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

বিবেকানন্দ কর্তার পরিশ্রমী ছিলেন। কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বুঝতেন না। তাই শিশুদের অভাবে অর্জুনেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। যশে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই বেলেড় মঠে তিনি সেহত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। ধর্ম তাদের পৃথক পৃথক হতে পারে। তবে সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম। জীবসেবা মানেই ঈশ্বরসেবা। মানুষকে ধর্মের কথা বলার আগে তার কারিগর মৌলন করতে হবে। তারণ খালিপেটে কেউ ধর্মের কথা শুনতে চায় না। ধনী-দরিদ্র, মুচি-মেথারে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই ভাই-ভাই। কোনো মানুষই অশ্লীল নয়, পেশা তার যা-ই হোক। অভাবিশ্রাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস উন্নতির প্রথম শর্ত। ধর্মচর্চার আগে শরীর সুস্থ ও বলবান রাখতে হবে। তারণ দুর্বল শরীরে শুধু ধর্ম নয়, কোনো কাজই ঠিকমতো হয় না। বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমরা অনুসরণ করব। তাহলে আমরাও জীবনে সফল হতে পারব।

একক কাজ : তোমার জানা জীবসেবামূলক কাজ বা ঘটনা সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : অশ্লীলতা, অপসকারীন।

পাঠ ৯, ১০ ও ১১ : ঠাকুর নিগমানন্দ

মেহেরপুর জেলার অন্তর্গত কুতুবপুর একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতেন জুবনমোহন ভট্টাচার্য নামে একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁর ত্রীর নাম মানিক সুন্দরী। উভয়ই নিয়মিত পূজা-পার্বণ ও প্রত্যাহার নিয়ে থাকতেন। মানিক সুন্দরীর পিতৃালয় মেহেরপুরেই অন্তর্গত রাধাকান্তপুর গ্রামে। এই গ্রামেই ১২৮৭ সালের (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ) বালন পূর্ণিমার রাতে বৃহস্পতিবার মাঝালায়ে ঠাকুর নিগমানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চোখদুটি ছিল পদ্ম বা নলিনীর মতো স্নেহেত। তাই তাঁর নাম রাখা হয় নলিনীকান্ত। নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য।



নলিনীর বয়স তখন সাত বছর। পিতা জুবনমোহন ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ষোলশুলা ও দুস্তপনর পাশাপাশি নলিনী পড়াশোনায়ও মেধার পরিচয় দিয়ে আসছিলেন শুল্ক থেকেই। তাই প্রাথমিকের পাঠ তিনি সাফসেল সজেই শেষ করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন দরিয়াপুর গ্রামের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে। থাকতেন রাধাকান্তপুরে মাঝালায়ে।

একদশ বছর বয়সে নলিনীর উপনয়ন হয়। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে ধর্মভাব জেগে ওঠে। তিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। নিয়মিত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করতেন। কিছু বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন সন্ধ করা যায়। তিনি জাতিভেদ মানেন না। ব্রাহ্মণের মিথ্যা অহংকারকে ঘৃণা করেন। তবে প্রকৃত সম্মানিত

ব্যক্তিকে সম্মান করেন। মুক্তি দিয়ে তিনি নিজের মতকে সমর্থন করেন। কিন্তু নিজের মত ঠিক নয় বুঝতে পারলে তিনি নির্বিকারে পরাজয় স্বীকার করেন। ধর্মের নামে ভ্রাতৃত্বকে তিনি তীব্রভাবে ঘৃণা করেন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সম্পর্কে নলিনীর দাদামশাই। তিনি নলিনীকে খুব প্রেম করতেন। নলিনীও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে কথা হতো। এর মধ্য দিয়ে নলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। নলিনীর ইংরেজি পল্লীকার আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর মা মনিক সুন্দরীও পরলোক গমন করেন। এ-দুটি ঘটনা নলিনীর মনে গভীর রেখাপাত করে। মানব জীবনের নশ্বরতা তাঁকে তীব্রভাবে ভাবিয়ে তোলে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নলিনীর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেবা-ভিয়ে, ধর্ম-কর্ম, শাস্ত্র সিনেত তাঁর বিশ্বাস উঠে যায়। ভগবানে বিশ্বাস নেই। ঐক সেবা সেম যাত্রা-খিয়েটার ও সাহিত্যচর্চায়। পাশাপাশি চলে জনসেবার কাজ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের বাড়ি গিয়ে গ্রামীণ সেবা করেন। কোনো বাড়িতে মৃতদেহ সংস্কারে লোক পাওয়া না গেলে নলিনী সেখানে সন্ধ্যায়ে এগিয়ে যান। এ নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শিতা ভুলনোমহনকে অনেক নিন্দাবাক্য শুনতে হয়।

নলিনীর এই অচরণ দেখে ভুলনোমহন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। পুত্রকে সংসারে অবস্থ করার জন্য তিনি তাঁর বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যথাসময়ে নলিনীর বিয়ে হয়ে যায়। কন্যা হালিশহরের বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সুধাংশুবালা। নলিনীর বয়স তখন ১৭ এবং সুধাংশুবালা ১২।

বিয়ের কিছুদিন পর নলিনীকান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবেন। তাই পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এখানে কিছুদিন পড়ার পর তিনি ঢাকার সার্ভে স্কুলে ভর্তি হন। কারণ, এখান থেকে পাশ করলে সহজেই চাকরি পাওয়া যায়। এখান থেকে পাশ করার পর তিনি অগ্রাহ্যে ঘিরে যান এবং কুতূবপুর স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর কিছুদিন পর ওভারসিয়ারের চাকরি নিয়ে মিনাজপুর সরকারি অফিসে যোগদান করেন। কিন্তু এ-চাকরিতে মিথ্যাচার করতে হয় বলে তিনি চাকরি পরিবর্তন করেন। এরপর আরেক নফা চাকরি পরিবর্তন করে তিনি কলকাতার জটিক জমিদারের এস্টেটে চাকরি নেন। সেই উপলক্ষে তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন। স্বামী সুধাংশুবালা তখন অসুস্থ। তাই তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্মে। কয়েকদিন পর কন্যাসন্তানটি মারা যায়। স্বামীও বেশ কিছুদিন রোগভোগের পর মারা যান। এতে নলিনী খুব অস্বস্ত পান। সংসারের প্রতি তাঁর মন উড়ে যায়। তিনি চাকরিও ছেড়ে দেন। প্রায়শই তিনি স্বামী সুধাংশুবালায় ছায়ামুঠি সেবতে পান। তিনি এর রহস্য জানতে চান। পরলোকে সম্পর্কে চর্চা শুরু করেন। এমনি সময় একদিন কলকাতায় পূর্ণানন্দ পরমহংসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পূর্ণানন্দ বলেন, স্বামী মারোই আত্মশক্তি মহামায়ার অংশ। তাঁকে পেতে হলে সধনা করতে হবে।

এরপর নলিনী যান বীরশূরের মহাশ্রী তরায়ীঠে। সেখানে ছিলেন মহাসংক বামাফেলা। তিনি তাঁকে তারামঠে দীক্ষা নেন। অর বলেন তারামঠের সধনা করতে দাখলেন। অবশেষে মা স্বামীপুত্র সেবা দিলেন। কিন্তু নলিনী তাঁকে ধরতে গেলেই তিনি মিলিয়ে যান। একথা তিনি বামাফেলাকে খুলে বলেন। বললেন, 'এ দেবী কে? অমিই- বা কে?' বামা বললেন, 'এ-তত্ত্ব জানতে হলে তোকে জ্ঞানসাধনা করতে হবে। জ্ঞানীপুত্র সম্প্রদায় করতে হবে।'

বামাকেপার কথামতো নগিনী জ্ঞানীগুপ্তের সম্মানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে পুষ্করতীরে এসে জ্ঞানীগুপ্তের সম্মান পান। তিনি হলেন সচিদানন্দ পরমহংস। তাঁর আশ্রমে থেকে নগিনী বেদ-বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্র দি অবয়ন করেন। গুরু তাঁকে বৈদিক সন্ন্যাস মন্ত্রে মীকা দেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় 'স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী'। এরপর তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে বেড়ান, যেমন—কাশী, কামাখ্যা, হিমালয়, কোকিলামুখ ইত্যাদি। এসব ভ্রমণে তিনি যোগসাধনা করেন।

এরপর জাহাতিত্যাগী ঠাকুর নিগমানন্দ সত্বে প্রচার শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ব্রহ্মচর্য সাধনার ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন না করলে পরবর্তী জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারবে না। পাশাপাশি তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবনগঠনের ওপরও জোর দেন। এ ছাড়া ঠাকুর কৃষিকর্ম, গো-সেবা, অনাথ আশ্রম, ঋষি বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও জনসেবার সূচীতে রেশ গেছেন।

ঠাকুর তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য 'অর্থা-দর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন, যা এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এটি সমান্তর ধর্মের সুখপত্র হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া ঠাকুর 'যোগীগুরু', 'জ্ঞানীগুরু', 'অর্থিক গুরু', 'প্রেমিকগুরু', 'ব্রহ্মচর্য সাধন', 'বেদান্তবৈক্য', 'তত্ত্বমালা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমেও তাঁর আদর্শ প্রচার করে গেছেন।

ঠাকুর নিগমানন্দের দর্শন ছিল—'শব্দরের মত ও গৌরবের গর্ভ', অর্থাৎ সেবা ও ভক্তির পথে অঁতের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। এই আদর্শ প্রচারে বাংলার চারদিকে চারটি সারস্বত আশ্রম সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সত্বে প্রচারের জন্য সহস্রাধিক সারস্বত সন্ন্যাসী রয়েছেন।

তত্ত্ব, জ্ঞান, যোগ ও প্রেম—এই চতুষ্টয়ে নিম্ন মহাসাধক ঠাকুর নিগমানন্দ ১৩৪২ সালের (১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) ১৩ই অগ্রহায়ণ শ্রুতবার অপরাহ্নে ১-১৫ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঠাকুরের কয়েকটি বাণী

১। আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন প্রতিষ্ঠাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীন ঋষিগণ প্রবর্তিত পথে চলে তোমরা আদর্শ গৃহস্থ হও। শুল্ক সন্ন্যাসী হলে বনে গেলেই ভগবান লাভ হয় না। গৃহ থেকে আদর্শ গৃহী হয়ে ধর্মসাধনা করলেও ভগবান লাভ হয়।

২। আত্মজ্ঞান কিংবা নারায়ণজ্ঞানে যথাসাধ্য জীবনোপায় করো। পরের উপকার করতে ব্যস্ত হয়ো না। এই প্রত্যেক ধর্ম ত্যাগ করলে অব্যাহিত শক্তি লাভ হয় না। জীবনোপায়ী কলির একমাত্র ধর্ম।

৩। মর-ই সাধ্য নারায়ণ। সুতরাং মরের সেবা ব্যতীত নারায়ণের কৃপা হয় না। তাই গার্হস্থ্য ধর্মের এত মাহাত্ম্য। অশান প্রাণকে বিদ্যুৎপের সঙ্গে মেলাতে হবে। স্বামী-পুত্র দ্বারা প্রথম প্রাণে যে-বীজ উৎপন্ন হয়, পরে বিশুদ্ধ কীট-পতঙ্গের সমপ্রাণতা আসে। তখন ভগবান যেতে দয়া করে থাকেন। নতুবা মূষের প্রাণায় তাঁর সিংহাসন টলে না।

৪। কেবল কতগুলো কর্মনিষ্ঠানে জীবনে পুঁজা লাভ হয়না। ভগবানে আত্মনির্ভর করতে অভ্যাস কর। কীট থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত একই ভগবানের বিকাশ জেনে সর্বস্বত্বের হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ কর। মানবজীবন ধন্য হবে। পবিত্র আত্মার অধিকারী হবে।

ঠাকুর নিগমানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, মিথ্যা অহংকার কারো পক্ষেই ভালো নয়। জাতিভেদ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসতে হবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি মানুশ্যে বাস্তব জীবনেরও উন্নয়ন প্রয়োজন। আদর্শ গৃহী হয়েছে ভগবানকে লাভ করা যায়। ন্যায়ায়ণজ্ঞানে মানুষকে সেবা করতে হবে। জীবসেবাই কলির একমাত্র ধর্ম। সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। সকল জীবের সেবা করা মানেই ঈশ্বরের সেবা করা। তাই সর্বজীবের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। ঠাকুর নিগমানন্দে এই শিক্ষা আমরা সব সময় মনে রাখব এবং আমাদের জীবনে পালন করার চেষ্টা করব।

মহীয় কাজ : ঠাকুর নিগমানন্দের জনহিতকর কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : কামাখ্যা, সত্যসত্য, আকীট।

পাঠ ১২, ১৩ ও ১৪ : ঠাকুর অনুকূচানন্দ

পানদায় পঞ্চার তীরবর্তী একটি গ্রাম হিমাইতপুর। সেই গ্রামে ১২৯৫ সালের ৩০ ভাদ্র (১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর) অনুকূচানন্দের জন্ম। পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতা মনোমোহিনী দেবী।

হিমাইতপুরেই অনুকূচানন্দের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়। হিমাইতপুর পাঠশালায় তিনি সেখানড়া শুরু করেন। সেখানকার পাঠ শেষ হলে তিনি পাবনা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। এখানে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে তিনি



পাচিমবঙ্গের নৈহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ-বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিক পরীক্ষার জন্য মনোনীত হন। কিন্তু একজন সহপাঠী পরীক্ষার ফিসের টাকা যোগাড় করতে পারেননি শুনে তাঁকে তিনি নিজের টাকা দিয়ে দেন। ফলে ঐবার তাঁর পরীক্ষা সেওয়া হয়নি। পরেরবার তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর মাদ্রাস ইছার তিনি কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তখন তাঁদের সংসারে আর্থিক অনটন চলেছিল। তাই অনেক কষ্ট করে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন প্রতিবেশী এক ভাড়াতর হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ওষুধসহ তাঁকে একটি বাস দেন। তা দিয়ে তিনি কুলি-মজুরদের সেবা শুরু করেন। সেবার অনেকের মধ্য দিয়ে যাওয়া হতো তাতেই তাঁর দিন চলে যেত।

অনুকূলচন্দ্র তাকুর হয়ে নিজ গ্রামে ঘিরে আসেন। সেখানে তিনি চিকিৎসাকর্ম শুরু করেন। এতে তাঁর অসুতপূর্ব সাফল্য আসে। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন, মানুষের দুঃখের স্থায়ী সমাধান করতে হলে কেবল শারীরিক চিকিৎসা নয়, মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসাও দরকার। কারণ শরীরের সঙ্গে মন ও অস্থার নিবিড় যোগ রয়েছে। তাই তিনি মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসাও শুরু করলেন।

অনুকূলচন্দ্র ছিলেন সমাজের অসহায়, অবহেলিতদের বন্ধু। তাদের নিয়ে তিনি কীর্তন দল গঠন করেন। কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের মানসিক শক্তির বিধান করেন। অনেক শিক্ষিত তত্ত্বগুণ এগিয়ে আসেন। তাঁর এই কীর্তন এক সময় একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। সবাই তাঁকে তখন তাকুর না বলে বলত 'ঠাকুর'। সেই থেকে তিনি 'ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র' নামে পরিচিত হন। তাঁর স্বাভিষ্ট ক্রমশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষ যাতে সং পথে থাকে, সং চিন্তা করে সেজন্ম ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র হিমাইতপুরে প্রতিষ্ঠা করেন সংস্কার আশ্রম। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসারীদের আত্মিক উন্নতির জন্য প্রযুক্তি জ্ঞান লাভে সহায়তা করতেন। দলে দলে লোক তাঁকে গুরু মেনে এই সংস্কার যোগ দিতে লাগল। তিনি এই সংস্কার মাধ্যমে ধর্মের সঙ্গে কর্মের সংযোগ ঘটান। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, সুবিবাহ— এই চারটি ছিল আশ্রমের মূল ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস— সনাতন আর্থ জীবনের এই চারটি স্তরে জীবনযাপনে তিনি সকলকে অভ্যস্ত করে তোলেন। অনুকূলচন্দ্র লোকহিতার্থে প্রাচীন ঋষিদের আদর্শ তপোবন বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, পাবলিশিং হাউজ, ছাপাখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে অর্থনৈতিক জীবনের পাশাপাশি মানুষ জাগতিক জীবনেও উপকৃত হয়। মহাত্মা গান্ধী সংস্কারের এই কর্মকাণ্ড দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং এর প্রশংসা করেন।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুকূলচন্দ্র বিহারের সেওঘরে যান এবং সেখানে সংস্কারের আদর্শে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর ভারত ভ্রমণ হলে তিনি আর ঘিরে আসেননি। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ৮১ বছর বয়সে তিনি সেওঘরেই শেষ ভ্রমণ করেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্যসম্প্রদায় এবং সংস্কারের কর্মকাণ্ড উভয় বাংলার নানা অঞ্চলে আজও সক্রিয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর আশ্রম ও কার্যালয় আছে। এর মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেওয়া হয়।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৪৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে-সবের মধ্যে পূণ্যপুঁথি, অনুশ্রুতি, চলার সাধী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা ছিল : মানুষে মানুষে কোনো জোদাতেন নেই। যে যে-সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, মনে রাখতে হবে ঈশ্বর এক, ধর্মও এক। সংসারে থাকবে, মন রাখবে ভাবাবে। পুণ্য লেখাপড়া করলেই বড় হওয়া যায় না, আচার-ব্যবহারও জানতে হয়। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই শিক্ষা আমরা সব সময় স্মরণে রাখব এবং মেনে চলব।

একক কাজ : ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : আত্মিক চিকিৎসা, লোক হিতার্থ, পূণ্যপুঁথি, অনুশ্রুতি।

পাঠ ১৫ ও ১৬ : মা আনন্দময়ী

মা আনন্দময়ীর জন্ম ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল। ব্রাহ্মবাড়িয়া জেলার খেওড়া গ্রামে। পিতা বিপিনবিহারী তইচাঁচাঁ, মা মোকদা সুন্দরী। বিপিনবিহারীর পৈতৃক নিবাস ছিল বিদ্যাকুট। আনন্দময়ীর আসল নাম নির্মলা সুন্দরী। গ্রামের পাঠশালায় নির্মলারপড়াশোনা শুরু হয় কিন্তু পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দিব্যভাবের প্রকাশ ঘটে। হরিনাম কীর্তন হলে তিনি আকুল হয়ে শুনতেন।



বাংলা ১৩১৫ সালের (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫ মাঘ নির্মলার বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স তেরো শেষ হয়ে গৌন বছর পড়েছে। অমী রমণীমোহন চক্রবর্তী। বাড়ি বিক্রমপুরের অটিপাড়া গ্রামে। বিয়ের পর নির্মলা স্বামীর নাম সেন ভোলানাথ।

ভোলানাথ বাড়িচলত পুরে সেটেলমেট বিভাগে চাকরি করেন। ১৩২৪ সালে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ) নির্মলা স্বামীর কর্মস্থলে যান। তাঁর মধ্যে ক্রমশই দিব্যভাব প্রকটিত হতে থাকে। কোথাও কৃষ্ণনাম শুনলে কৃষ্ণপ্রসঙ্গে তিনি আকুল হয়ে যান। একবার লুণ্ঠচন্দ্র বসুর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে :

হরিরায়ের নাম কৃষ্ণসদায় নয়।

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নয়।

নির্মলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কীর্তন শুনতে শুনতে এক সময় তিনি অজান হয়ে যান। তখন তাঁর সেহ থেকে দিব্য আলো প্রবাহিত হচ্ছিল। সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার সূক্ষ্ম হয়ে উঠলেন। এভাবে নির্মলার মধ্যে মহাভাবের শুরূ। সাধারণ মানুষের অজান্তে তাঁর শরীরে চলতে লাগল সাধন-ভজনের নানাবিধ লীলা। দিব্য জ্যোতির আভাষ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর সমগ্র শরীর।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ভোলানাথ চলে আসেন ঢাকার শাহবাগে। তখনকার স্রাবের বাগানের তত্ত্বাবধায়কের কাজ নিয়ে। সঙ্গে নির্মলাও আসেন। এই শাহবাগে মা কালীর মন্দিরে নির্মলার মধ্যে মাতৃমূর্তি প্রকটিত হয়। তখন থেকেই তিনি ‘মা আনন্দময়ী’ নামে খ্যাত হন। এখান থেকেই তাঁর সাধন-ভজন চলতে থাকে। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংধপুরীতে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই তাঁর আদি আশ্রম।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে মা আনন্দময়ী স্বামীসহ সঙ্গে যান দেবাদ্রুমে। ফলে তাঁর লীলাক্ষেত্র ঢাকা থেকে সখ্যান্ডগিরি হয়ে উত্তর

ভারতে। সেখানে তাঁর দিব্যভাবের পরিচয় জানাজানি হলে অনেকে তাঁর ভক্ত হয়ে যান। ভারতের অনেক জানী-পুণী তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের সঙ্গে মাল্লের সাক্ষাৎ হয়েছে। এমনকি গভ্রিত জওহরলাল নেহরু, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে।

মা আনন্দময়ী নিজে ভগবৎপ্রেমী ছিলেন। তাই ভারতের জনগণকেও ভগবৎপ্রেমী করার কাজে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি উপমহাদেশের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র পরিত্রমণ করেছেন। প্রাচীন ভারতের অনেক লুপ্ত ভগবান ও তীর্থস্থান তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মস্থল, সহস্র ঋষির তপোভূমি নৈমিষারণ্যকে তিনি জুড়িয়ে তোলেন। এখন সেখানে কীর্তন, নাচ, গান, ধর্মগ্রন্থপাঠ, সংসদ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চলেছে। এভাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের লুপ্ত, লুপ্ত ধর্মস্থানকে জাগ্রত করেছেন। সেখানে যোগ-যজ্ঞ, মন্দির, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মতো দিয়ে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সনাতন ধর্মের ভাবধারা উজ্জীবিত করে তুলেছেন। মানুষের মনকে ভগবৎপ্রেমী করার জন্য অশেষ প্রেরণা দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের রমনা ও খেওড়ার দুটি আশ্রমসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি ২৫টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পক্ষে এটি মায়ের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। মা আনন্দময়ী বলতেন, 'যে যে অবস্থায় আয়, সেই অবস্থায় থেকেই কর্ম করে যাও। নম কর, শ্রম নাও। নামেই সব হয়।'

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ আগস্ট মা আনন্দময়ী পরলোক গমন করেন। হরিদ্বারে কণ্ঠল আশ্রমে গল্গার তীরে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সর্বদা ভগবানের নাম নিতে হবে। তাঁর নামে সব কিছু করতে হবে। কর্তব্যকর্মে অবহেলা করা চলবে না। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। মায়ের এই শিক্ষা আমরা মেনে চলব।

একক কাজ : ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চায় কেন্দ্রে মা আনন্দময়ীর অবদান সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : দিব্যভাব, পুনরুজ্জীবিত, সমাধিস্থ।

পাঠ ১৭ ও ১৮ : শ্রীল তত্ত্ববেদান্তমায়ী প্রহ্লাদ



শ্রীল তত্ত্ববেদান্তমায়ী প্রহ্লাদ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতায় ১৫১ নং হারিসন রোডের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গৌরমোহন দে এবং মায়ের নাম রজনী। প্রহ্লাদের প্রকৃত নাম অভয়চরণ দে।

গৌরমোহন এক জ্যোতিষীকে দিয়ে পুত্রের কোষ্ঠী তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই শিশু ৭০ বছর বয়সে সমুদ্র পান্ডি লেবে। বিদেশ যাবে। একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করবে এবং ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায়

সবটাই সত্যে পরিণত হয়েছে। অভ্যচরণ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে আমেরিকা যান। সেখানে হিন্দুধর্মে প্রচার করেন। ক্রমশ তাঁর ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ’, সংক্ষেপে যা ‘ইসকন’ নামে পরিচিত। আর তিনি পরিচিত হন ‘শ্রীল ভক্তিবিনোদস্বামী প্রভুপাদ’ নামে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তিনি শতাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গৌরমোহন দে ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত বালু-বাবসারী। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। নিয়মিত কৃষ্ণনাম জপ করতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন তাঁর আদর্শ। চৈতন্য প্রবর্তিত ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ ছিল তাঁর সাধনার মূলমন্ত্র। তিনি নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবতস্মৃতি ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করতেন। তিনি চাইতেন যেনে অত্যাচরণও তাঁর মতো বৈষ্ণব হোক। এজন্য তিনি তাঁকে নিয়মিত রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে নিয়ে যেতেন। বালক বয়সেই তাঁকে মৃদঙ্গ বাজানো দেখান। ভজন, কীর্তন ইত্যাদি দেখায় উৎসাহ দেন।

অভ্যচরণের মা রজনী দেবী ছিলেন বর্ষিষ্ণু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা। তাই তাঁর মধ্যেও বৈষ্ণবতাবের প্রকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন পতিব্রতা ও ধর্মপরায়া একজন আদর্শ স্ত্রী ও জননী। বালক অভ্যচরণ দেখতে, তাঁর মা কীরকম সরলভাসহকারে সকলের মজলসের জন্য প্রার্থনা করতেন। পুষ্প-পার্শ্ব অনুষ্ঠান করতেন। মায়ের এই ভক্তি, সরলতা ও কর্তব্যপরায়াণতা বালক অভ্যচরণের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

অভ্যচরণ কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে দ্ব্যতক শ্রেণির ছাত্র। এ-সময় তাঁর নিয়ে হয়। ‘স্টীল’ নাম রাখারপিন দেবী। কিন্তু রাখারপিন পিত্রালয়েই অবস্থান করছিলেন, অভ্যচরণের পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। অভ্যচরণের ওপর তার একটা প্রভাব পড়েছিল। একই কলেজে এক ক্লাস ওপরে পড়তেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে অভ্যচরণ মুগ্ধ হন। কিন্তু সরাসরি আন্দোলনে যোগ দেন না। তবে ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর একটা অসীমার তাব সৃষ্টি হয়। এর চেয়ে তিনি ভারতের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে অবিকতর মজলসজনক মনে করেন।

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের প্রতিও অভ্যচরণ একটা আকর্ষণ অনুভব করেন। মনোযোগ নিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি শুনতেন এবং পাঠ করতেন।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে অভ্যচরণ সফলতার সাথে দ্ব্যতক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এ-সময় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে শতশত নিরস্ত্র-নিরীহ মানুষকে ইংরেজ সৈন্যরা হত্যা করে। এর প্রতিবাদে গান্ধীজি ইংরেজদের সবকিছু বর্জনের আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভ্যচরণ তাঁর ভিগ্নি প্রত্যাবাসন করেন। এ-ঘটনার পর শিতার ইচ্ছায় তিনি একটি গুরু কোম্পানিতে চাকরি নেন এবং ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে এই কাজেই সপরিবারে এলাহাবাদ চলে যান।

এলাহাবাদে এসেই অভ্যচরণের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এখানে তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদসরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে অভ্যচরণের ইতালুর্বেও (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) কলকাতার একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। অভ্যচরণ তখন হৃদয়ঙ্গম আন্দোলনের ভাবধারায় উন্মূষ ছিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তখন তাঁকে বলছিলেন, ‘এসব আন্দোলনের চেয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব আন্দোলন অনেক কার্যকর। “হরে কৃষ্ণ হরে রাম” কীর্তন অতি সহজেই সকল শ্রেণির মানুষকে কাছে টানতে পারে। সংসারের সমস্ত বন্ধন মুগ্ধ-কষ্ট ভুলিয়ে শান্তি দিতে পারে। কলিযুগে জীবনোদ্ধারের এটাই একমাত্র পথ।’ সেই একই কথা ঠাকুর এবারও অভ্যচরণকে বললেন। অভ্যচরণ এবার গুরুর অশেষ শিরোधार্য করে কাজ শুরু করে দিলেন।

অভ্যচরণ পুত্র উপদেশ ও নিজের আদর্শ প্রচারের জন্য Back to Godhead নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁর তিনটি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি প্রথম দুটির ভাষ্য রচনা করেন। সবার কাছেই তা অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। তিনি তাঁর পত্রিকা এবং গ্রন্থ অবকাশীন ভারতের বিখ্যাত মনীষীদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করেছেন। এঁরা তাঁর কাজের উচ্চশ্রংখলা করেছেন।

অভ্যচরণ এক সময় কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য চাকরি, সংসার সব ছেড়ে দেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। এক পর্যায়ে তিনি বৃন্দাবনে যান। সেখানে তিনি সন্ন্যাসধর্মে লীলা নেন। তখন তাঁর নাম হয় 'অভ্যচরণারবিন্দ ভক্তিবৈদ্যভাস্করী'। আরও পরে তিনি 'শ্রীল ভক্তিবৈদ্যভাস্করী প্রভুপাদ' নামে খ্যাত হন।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকেতু বৃন্দাবনে ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বাস করতেন, সকল জাতির মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে পারলে কোনো জাতিভেদ থাকবে না। হিংসা-বিরোধ থাকবে না। সবাই সবাইকে ভালোবাসবে। কৃষ্ণ-বিগ্রহ ইত্যাদি ধনসামগ্রিক কাজ থেমে যাবে। তাঁর পুত্র সরস্বতী ঠাকুরও তাঁকে একথাই বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, ভারতবর্ষের বাইরেও এই কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে এর মাধ্যমে বিশ্বাত্মক গড়ে উঠবে। এ-কারণেই শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যান। পরের বছর ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠা করেন 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সন্য' (ইসকন)। পর্যায়ক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভুপাদ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সংস্থাটি পরিচালনা করেন। তিনি শাস্ত্রবিক মন্দির, অশ্রম, স্কুল ও কৃষ্ণকেন্দ্রের সমন্বয়ে এটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসকনের ৩৫০টিরও বেশি মন্দির রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে এর প্রধান মন্দির অবস্থিত। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা প্রভৃতি শহরেও ইসকনের মন্দির রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষ প্রভুপাদ-প্রবর্তিত এই মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণনামে লীলিত হচ্ছেন। এভাবে তাঁরা একটি কৃষ্ণ-পরিবার তৈরি করে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় জীবনাচার পালন করছেন। ইসকনের মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণনামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সৃষ্টি করা। মানুষ-মানুষে ভেদভেদ দূর করা। জ্ঞানের অলো হারা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করা। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করা। শিশুদের মধ্যে শিক্ষাদান করা। দরিদ্রদের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসা প্রদান করা। গীতার দর্শন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনাও ইসকনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নতুন শব্দ : মূলজা, বর্ষিষ্ণু, ঐক্যীয় বৈষ্ণব, ইসকন, বৈষ্ণবীয় জীবনাচার।

পরিকল্পিত কাজ : শিকাগো উপরে বর্ণিত মহাপুত্র ও মহীয়সী নারীদের ছবি সংগ্রহ করবে। তাঁদের শিক্ষাসমূহ একটা কাগজে লিখে পড়ার টেবিলের সামনে টানিয়ে রাখবে, যাতে সব সময় তা চোখে পড়ে। পঠা-বহির্ভূত অন্যান্য মহাপুত্র ও মহীয়সী নারীদের সম্মুখকোণে জানার চেষ্টা করবে এবং তাঁদের ছবি সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কৃষ্ণ সারাজীবনই রক্ষা করেছেন।
২. দুর্বল শরীরে হয় না।
৩. নলিনীর দাদামশাই ছিলেন।
৪. ঠাকুর অনুকূচানন্দ শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসাও শুরু করেন।
৫. শাহবাগে মা কাণীর মন্দিরে নির্মলার মতো প্রকটিত হয়।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যহেঁদ নিয়ে বামপাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ভরাসম্বল ছিলেন মণ্ডলের রাজা এবং	দুর্যোধনের আত্মীয়
২. মতুরা সম্রাটের হরিচাঁদ ঠাকুরকে	বিষ্ণুর অবতার হিসেবে জ্ঞান করেন
৩. নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট	ভাগ্যের মন্ত্রে লীলা নেন
৪. নলিনী জ্ঞানী গুরু সম্প্রদায় পান	নিজ গ্রামে ফিরে আসেন
৫. অনুকূচানন্দ তাকুর হয়ে	কংসের শত্রুর পুষ্করতীরে

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
২. হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারীদের 'মতুরা' বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
৩. ঠাকুর নিগমানন্দের পরলোক সম্বন্ধে চর্চা করার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর।
৪. ঠাকুর অনুকূচানন্দ মাসিক চিকিৎসা শুরু করেছিলেন কেন?
৫. স্বামী বিবেকানন্দ যুবকদেরকে শরীর গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কেন?

নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও :

১. 'শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংস বধ ছিল অবশ্যম্ভাবী' মতব্যাটি বিশ্লেষণ কর।
২. নিকাগের বিশুদ্ধ সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের প্রভাব বর্ণনা কর।
৩. ঠাকুর নিগমানন্দের দর্শন ব্যাখ্যা কর।
৪. ঠাকুর অনুকূচানন্দ প্রতিষ্ঠিত সংস্কারের কর্মকাণ্ড বর্ণনা কর।
৫. 'হিসকনের' মূল উদ্দেশ্য ও সমাজে এর প্রভাব বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সুবিষ্ঠার রাজস্ব যাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছিলেন কে ?

- | | |
|----------|--------------|
| ক. ভীষ্ম | খ. শ্রীকৃষ্ণ |
| গ. বলরাম | ঘ. বিদুর |

২. 'ধর্মচর্চার জন্য সংসারত্যাগের প্রয়োজন নাই'—এবুশ বক্তব্যটি—

- হরিচাঁদ ঠাকুরের
- ঠাকুর অনুকূচানন্দের
- মা' অগমমহারীর

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনমোহনবাবু জনদরদি ও ধর্মিক মানুষ কিন্তু তিনি হুসরোগে আক্রান্ত। হাটে ট্রাক ধরা পড়েছে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি টাকার সাহায্যে হাসপাতালে অপারেশনের জন্য ভর্তি হন। তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর পাশের রোগীর অবস্থা আরও খারাপ। কিন্তু টাকার অভাবে অপারেশন করতে পারছে না। তিনি তার নিজের অপারেশনের টাকা পাশের রোগীকে দিয়ে সেন।

৩. মনমোহনবাবুর আচরণে কোন সাধকের আদর্শ ফুটে উঠেছে ?

- স্বামী বিবেকানন্দের
- ঠাকুর অনুকূচানন্দের
- হরিচাঁদ ঠাকুরের
- ঠাকুর নিগমানন্দের

৪. সাধন-ভজনে উক্ত সাধকের মর্মকথা হলো—

- জীবসেবা করলে ঈশ্বরসেবা হবে
- সংসারে থেকেও ভগবানের প্রতি মন রাখতে হবে
- ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিশেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে
- সেবা ও ভক্তির পথেই অঁকিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

- কাননদেবী চাকুরি, সাংসারিক কাজ ও ধর্মকর্ম সুনিপুণভাবে পালনের মাধ্যমেই ঈশ্বরসেবার আনন্দ পান। ব্যক্তিজীবনে তাঁর একটি বিশেষ আকাজকা ছিল বাড়িতে রাধা-গোবিন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর ইচ্ছাটি সার্থকভাবে পূরণ করার জন্য তিনি উপার্জিত অর্থে এলাকার পুরাতন মন্দির সংস্কার ও একটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাধাগোবিন্দের পূজার ব্যবস্থা করেন। তিনি এলাকার মানুষকে সেব-সেবীর পূজার মাধ্যমেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করা যায় এ-বিষয়ে সচেতন করেন।

ক. মা আনন্দময়ীর পূর্ণনাম কী ?

খ. মা আনন্দময়ীর কৃষ্ণশ্রেণে অকুল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. কাননদেবীর সংসারবর্মে পালনের সাথে মা আনন্দময়ীর কর্মময় জীবনের কী বৈষাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'এলাকার মানুষের প্রতি কাননদেবীর ঈশ্বর-অরাহণার বক্তব্য যেন মা আনন্দময়ীর বক্তব্যেরই প্রতিফলন'— তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত ? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

- বিধান ও কমল এলাকায় চিহ্নিত সত্ৰাসী ও চাঁদাবাজ। তাদের অভ্যুত্থানে এলাকার জনগণ অতিষ্ঠ। শ্যামল সখ ও ধর্মপরায়ণ। এলাকাতে তিনি অনেককেই ধর্মপথে ফিরিয়ে এনেছেন। বিধান ও কমলকে আইনের রক্ষকপণ নিচিহ্ন করে ফেলাতে চাইলেও শ্যামল তাকে আপত্তি জানান। তিনি বিধান ও কমলকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে দায়িত্ব নিনেন। শ্যামল বিধানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলেও কমলকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। কমল তার আগের কর্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। একদিন অপরাধ সংঘটনকালে সে জনগণের হাতে ধরা পড়ে এবং নিহত হয়।

ক. জরাসন্ধ কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন ?

খ. দুর্ধেখন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় অহ্বান করেছিলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. কোন নৈতিক শিক্ষার অশোকে শ্যামল বিধানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন?
তোমার পঠিত 'শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত' শিক্ষার অশোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ন্যায়ের পথে কমলের ফিরে না আসার কারণ তোমার পঠিত শ্রীকৃষ্ণের কংসবধের শিক্ষার অশোকে দৃঢ়ায়ন কর।

অষ্টম অধ্যায় হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি ও বৈশ্বিক পর্যায়ে একজন ব্যক্তি বা জাতির আচরণ অন্য ব্যক্তি ও সমাজ বা জাতির প্রতি কেমন হবে, তা নির্ধারণের মাপকাঠিটিই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। যেমন— মানবতাবোধ, সদ্ব্যবহার, ন্যায়বিচার, সদ্ব্যবসায়, সহ্যম, অহিংসা প্রভৃতি।



আমরা জানি, নৈতিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বিচার করা যায়, কে বা কোন জাতি কতটা সত্য ও ব্যক্তি ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। আবার নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বোঝা যায়, কে কতটুকু ধর্মীয় মহত্ব আদর্শ পালন করে। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের একটা সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

আমরা এ-অধ্যায়ে নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা এবং ন্যায়বিচার, সদ্ব্যবসায়, সহ্যম ও অহিংসা— এ-মূল্যবোধগুলো হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করব। ব্যাখ্যা করব পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এসব মূল্যবোধ গঠনের উপায়।

অহিংসা এবং সহ্যমের সঙ্গে সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এইডস রোগের কারণ, এর প্রভাব ও এর প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করব।

এ-অধ্যায় থেকে আমরা—

- ☐ নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ হিন্দুধর্মের আলোকে ন্যায়বিচার, সদ্ব্যবসায়, সহ্যম ও অহিংসা— এ-নৈতিক মূল্যবোধগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার, সদ্ব্যবসায়, সহ্যম ও অহিংসা— এ-নৈতিক মূল্যবোধগুলো গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ এইচআইভি/এইডসের কারণ, প্রভাব ও এর প্রতিরোধ করণীয় এবং এইডস রোগে অক্রান্ত রোগীর সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত, তা হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে আলোচিত নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রতিফলন ঘটায় উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা

আমরা জানি, ‘নীতি’ কথাটির অর্থ হচ্ছে কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা উপলব্ধি করে ভালো কাজ করায় উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং ভালো কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রবণতা।

নীতির সঙ্গে জড়িত যে-বিষয়, তাকে বলা হয় ‘নৈতিকতা’। যেমন, নৈতিক শিক্ষার অর্থ নীতি-সম্পর্কিত শিক্ষা।

সত্য কথা বলা উচিত। তাই আমরা সবাই সর্বদা সত্য কথা বলব। পুরুষদের ভক্তি করা কর্তব্য। তাই সবাই পুরুষদের ভক্তি করব, তাঁদের সেবা করব। ঈশ্বরজনে জীবের সেবা করব। কারণ জীবের মধ্যে আত্মরূপে ঈশ্বর বিরাজ করেন। এভাবে নৈতিক শিক্ষা থেকে জীবনধারণের ক্ষেত্রে আমাদের যে-নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয়, তার নাম মূল্যবোধ।

সকল মানুষেরই এ-মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন। যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে বা সমাজে এর ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে আমরা বলি, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। এ-মূল্যবোধের প্রকাশ নানাভাবে ঘটতে পারে। যেমন— স্তুতি বা পৌন্দর্য সম্পর্কে মূল্যবোধ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ ইত্যাদি। ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি এবং আন্তর্জাতিক— এ-তিন পর্যায়েই নির্দিষ্ট মূল্যবোধ দ্বারা আমরা পরিচালিত হই।

মূল্যবোধকে যখন নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা হয়, তখন তাকে বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ।

‘মূল্য’ কথাটা দ্বারা মান বা পরিমাণ বোঝায়। মূল্যবোধ হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার বোধের একটি অংশ মাত্র। সুতরাং এদিক থেকে ‘নৈতিক মূল্যবোধ’ মূল্যবোধের একটি মানকে নির্দেশ করে। যেমন— কোনো মানুষকে আমরা কেমন দৃষ্টিতে দেখব? নৈতিক মূল্যবোধ বলে : নিজের সমান জ্ঞান করতে হবে। কিন্তু আমরা অনেক সময় পেশা বিত্ত পদমর্যাদা প্রভৃতি বিবেচনা করে ব্যবহারের মান নির্ধারণ করি। এতে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে না। যখন মানুষকে প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান দিতে বিত্ত, পেশা, পদমর্যাদা, ধর্মমত বিবেচনায় না নিয়ে, সাম্যের দৃষ্টিতে দেখি, তখন তার মধ্যে ঘটবে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকৃত প্রকাশ।

ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মসম্বন্ধে জীবনধারণের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে। আবার নৈতিক মূল্যবোধগুলো ধর্মের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়।

হিন্দুধর্ম নৈতিক মূল্যবোধের একটি উচ্চমান প্রত্যাশা করে। যিনি ধর্মিক, তাঁর আচরণের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটতেই হবে। কারণ নৈতিক মূল্যবোধগুলো ধর্মের অঙ্গ।

এখানে আমরা হিন্দুধর্মের আলোকে ন্যায়বিচার, সংসঙ্গ, সংযম, অহিংসা— এ-মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে জানব।

নতুন শব্দ : উদ্বুদ্ধ, বিত্ত, প্রতিপালন।

পাঠ ২ : ন্যায়বিচার

একসঙ্গে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ যে-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, তার নাম সমাজ। সমাজে সকলকে মিসেমিশে থাকতে হয়। কিন্তু নানা কারণে সমাজের সদস্যদের মধ্যে মতের অমিল দেখা দেয়। মতের অমিল মনের অমিলে পরিণত হয়ে কলহা গর্বস্ত গড়ায়। তখন দু'পক্ষের মধ্যে কে সঠিক এবং কে সঠিক নয়, তা নির্ণয় করতে হয়। আবার দু'পক্ষের জন্য কাউকে অভিযুক্ত করলেই তাকে দণ্ড দেওয়া যায় না। অসলেই সে অপরাধী কি না তা নির্ধারণ করতে হয়। কোনো বিষয়ে কে সঠিক এবং কে ভ্রান্ত, অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী না নিরপরাধী এ-বিষয়ে সিল্ষান্ত গ্রহণের যে পদ্ধতি, তার নামবিচার।



বিচারককে থাকতে হয় নিরপেক্ষ। তাকে নির্ভুলভাবে বিচার করতে হয় কে সঠিক আর কে সঠিক নয় কিংবা অভিযুক্ত অপরাধী না নিরপরাধ। কোনো পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে নীতি এবং ধর্ম বা আইনের আলোকে বিচার করার নাম ন্যায়বিচার।

ন্যায়বিচার সমাজকে সুপথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বিচারক যখন বিচার করেন, তখন কে পুত্র, কে বশু, কে অতীত, তা দেখেন না। তাকে ন্যায়-নীতি, ধর্ম বা আইন এবং যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। সেখানে শ্রম্ভা, ব্রহ্ম, ভালোবাসা প্রভৃতি আবেগের কোনো স্থান নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য কষ্ট পেলেও বিচারককে ন্যায়বিচার করতে হয়।

এ-বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কীদে হবে

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

অমরা বিযুক্ত প্রহাদের কথা জানি। তিনি দৈত্যকুলে জন্ম নিয়েও বিযুক্ত হয়েছেন। ন্যায়বিচারের জন্যও তিনি প্রসিযুক্ত হয়ে আছেন। এখন মহাভারত থেকে তাঁর ন্যায়বিচারের একটি উপাখ্যান জানব।

পাঠ ৩ : প্রহাদের ন্যায়বিচার

বিযুক্ত প্রহাদ রাজত্ব করছেন। তাঁর সুশাসনে প্রজারা সুখেই আছে। তাঁর ছেলে বিরোচন। বিরোচন রাজপুত্র বলেই হোক, আর নিজের চরিত্রের জন্যই হোক, কিছুটা উয্বত আর অহংকারী। তখন রাজধর্মীতে সুধর্ম নামে এক তরুণ প্রাণল ছিলেন। এই সুধর্মার সঙ্গে রাজপুত্র বিরোচনের সম্পর্ক ভালো ছিলো না। একবার দুজনের মধ্যে কে জাদে ও গুণে অগ্রগণ্য তা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তখন বিরোচন বলেন, 'চলো, আমরা বিদ্বান ব্যক্তিদের কাছে এ-বিদ্বানে বিচারের ভার অর্পণ করি।'



তখন সুধর্ম বললেন, ‘রাজা হলেন শাসক। সুতরাং রাজার কাছেই বিচার প্রার্থনা করা উচিত। চলে, আমরা তোমার পিতা মহারাজ প্রহ্লাদের কাছে যাই। আশা করি তিনি ন্যায়বিচার করবেন।’

দুজনে মহারাজ প্রহ্লাদের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করলেন। মহারাজ প্রহ্লাদ সব শুনে বললেন, ‘রাজপুরে বিরোচন শক্তিমান ও সুশিখমান; কিন্তু তার ঔশ্বত্য ও অহংকার তার চরিত্রকে কিছুটা মলিন করেছে— যেমন চাঁদের রয়েছে কলঙ্ক।’

বিরোচন : পিতা—

প্রহ্লাদ : হ্যাঁ পুত্র। বাবা দিও ন, আমাকে বলতে দাও।

প্রহ্লাদ বলতে লাগলেন, “ব্রাহ্মণকুমার সুধর্ম ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী এবং ঠাঠ ও সংযমের বসে বসীয়া। অহিংসা তার চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করেছে। সুতরাং বিরোচন ও সুধর্মার মধ্যে সুধর্মই জানে ও গুণে অগ্রগণ্য।”

পুরের প্রতি গুরুপাতিত না দেখিয়ে নিরপেক্ষভাবে প্রহ্লাদের এ-বিচার ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

একক কাজ : প্রহ্লাদের ন্যায়বিচারের শিক্ষা তুমি কীভাবে জীবনচরণে প্রয়োগ করবে।

পাঠ ৪ ও ৫ : সৎসজা

সৎসজা হচ্ছে সৎসঙ্গের সান্নিধ্য। সৎ লোকের সঙ্গে চলা-ফেরা, গুঠা-বসা কিংবা জীবনযাপন। সৎসজা অত্যন্ত মধুর। সৎসঙ্গের সঙ্গে থাকতে নিশ্চিত খারাপ হয়। কারণ সৎসঙ্গের কারো কতি তে করেনই না, বরং পারলে উপকার করেন। তাই তো প্রবচন রয়েছে, ‘সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ’।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পরমহংসদেব ব্রহ্মচারী সৎসঙ্গের কথা ভক্তদের বলেছেন। তিনি বলেছেন যে সৎসজা মনকে পবিত্র করে, চরিত্রকে উন্নত করে এবং ভক্তিতার জাগ্রত করে।

আমরা শূন্যে পরিণামের লোহকে অর্থে পরিণত করে। তেমনি সবসময় দুর্ভিক্ষও সব ও মহৎ করে তোলে।

এ-সম্পর্কে একটি কাহিনী বলছি।

সাদু ও শ্রীধর

ছায়া সুনিবিড় সুন্দর একটি গ্রাম। সেখানে বাস করত একটি কিশোর। নাম তার শ্রীধর। ভীষণ দুখ ছিল সে, অল্পতই রোগে যেত। বাগড়া লাগিয়ে মারামারি করত। এমনকি চুরি করতও তার কোনো কষ্টা ছিল না।

শ্রীধর একদিন দুরতে দুরতে এল বদরিকা আশ্রমে। বিখ্যাত আশ্রম। কত মন্দির, কত ধর্মশালা, কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সেখানকার এক মন্দিরে গেল সে। সেখান, মন্দিরের বিশ্রহের গলার বুলছে মুক্তার মালা। রাত পর্বত অপেক্ষা করল সে। তারপর গভীর রাতে সুকৌশলে চুরি করল সেবিশ্রহের গলার সেই মুক্তার মালা। চুরি করে সেখান থেকে পালান সে।

সুন্দর মালাটি গলার পরে সে পথে চলতে লাগল। দুরতে দুরতে সে এল এক সাধুর আশ্রমে।

সাদু তাঁর সাদানার পাশাপাশি সেবা-শুশ্রূষা করেন। বলেন, জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।



সাদু শ্রীধরকে বললেন, 'আমার একটা উপকার করতে পারবে, বাবা?'

শ্রীধর, 'কী করতে হবে বলুন।'

সন্ন্যাসী তখন তাঁর গোলা থেকে একটি মুক্তা বের করে বললেন, 'এ মুক্তাটি একজনের মালা থেকে খসে পড়েছে। মালার মালিক বদরিকা আশ্রম থেকে এসেছেন। তিনি চলছেন তাঁর দেশে। মুক্তাটি আমি তোমাতে দিচ্ছি। পথ চলতে যদি দেখা হয়, তাহলে ওটা তাঁকে দিয়ে দিও।' শ্রীধর মুক্তাটি হাতে নিল তারপর নিজের মালায় হাত দিয়ে সেখান, মুক্তাটি তার গলার মালা থেকেই খসে পড়েছে। কখন কীভাবে পড়েছে, তা সে নিজেই জানে না।

সাদুকে প্রশ্ন করল শ্রীধর, 'আপনি কেমন করে জানলেন যে আমার গলার মালা থেকেই মুক্তা খসে পড়েছে? কিন্তু মালাটি আমার নয়, আমি এটা বদরিকা আশ্রমের এক সেবাবিশ্রহের গলা থেকে চুরি করেছি। এখন কী করব আমি।'

একথা বলেই সে কানতে লাগল।

সাদু বুঝলেন, অসং ক্রমে সত্যতার উদয় হয়েছে। তিনি শ্রীধরকে বললেন, 'বাবা শ্রীধর, একবার পাশ করলে যে চিরকাল করতে হবে, তা নয়। এসো, পুণ্যের পথে এসো। সেবতার মালা তুমি সেবতাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। তাহলে তিনিই তোমাকে ক্ষমা করবেন।'

সাদুর কথাগুলো শ্রীধর বদরিকা আশ্রমে গেল, কাউকে না জানিয়ে সেবাবিশ্রহের গলার সেই মুক্তার মালাটি পরিয়ে দিল। তারপর বাড়ি না গিয়ে ফিরে গেল সেই সাদুর আশ্রমে।

শ্রীধর সাদুর সঙ্গে থাকে। সাদু প্রতিদিন ভোরে স্নান করেন। শ্রীধরও প্রতিদিন ভোরে উঠে স্নান করা শুরু করল। সে সেখানে পড়ল আশ্রমের নানা কাজে।

একদিন নদীতে একটি বিড়ালকে হাবুডুবু খেতে দেখে সে কাঁপ দিয়ে পড়ল। তুলে আনল বিড়ালটিকে।

সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত এক ভিখারির শব কাঁধে করে শূশানে নিয়ে গেল সে।

এভাবে অর্ন্তের সেবার ব্রতী হলো শ্রীধর।

একদিন সে সাদুর অনুমতি নিয়ে বাড়ি গেল। তাকে দেখে কেউ চিনতে পারল না। পারবে কী করে? সে তো আর আগের শ্রীধর নেই। সে এখন তরুণ সাধক। তবে তার মা তাকে চিনলেন,

‘শ্রীধর, তুই!’

‘হ্যাঁ মা আমি। আমি তোমার শ্রীধর।’

দুর্ভুত শ্রীধর নয়, চোর শ্রীধর নয়। সে এখন সং ও সেবাব্রতী।

সংসজ্ঞা এভাবে দুর্ভুতকে সং ও সেবাব্রতী এক মহান মানুষে পরিণত করতে পারে।

সংসজ্ঞার এমনই মহিমা।

দলীয় কাজ: শ্রীধরের শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখ।

নতুন শব্দ : কুষ্ঠা, ধর্ষণালা, বিয়হ, শব, ব্রতী, দুর্ভুত, সেবাব্রতী।

পাঠ ৬ ও ৭ : সংযম

‘সংযম’ কথাটির অর্থ হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। শাস্ত্রে হিন্দুধর্মের যে-দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, ‘দম’ ও ‘ইন্দ্রিয়নিগ্রহ’ সেগুলোর অন্তর্গত। ‘দম’ মানে দমন করা। ‘ইন্দ্রিয়নিগ্রহ’ মানে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা। ইন্দ্রিয়ের দাবি অনুসারে না চলে তাকে নিজের ইচ্ছামতো চালানোকেই বলে ‘ইন্দ্রিয়নিগ্রহ’।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ধরা যাক, বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান। একটি ঘরে প্রচুর দই-মিষ্টি এনে রাখা হয়েছে। আমি ঐ ঘরে ঢুকলাম। ঘরে আর কেউ নেই। আমার লোভ হলো, ওখান থেকে একটা মিষ্টি তুলে খাই। কেউ তো আর দেখছে না। পরাকণেই চিন্তা হলো, মানুষ না হোক ঈশ্বর তো দেখছেন। তাছাড়া ছুরি করা একটা আনৈতিক কাজ। তাই আমি লোভকে দমন করলাম। এর মধ্য দিয়ে আমার গিহবা নামক ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ করা হলো। দম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে একসঙ্গে সংযম বলা হয়।

এ-সংযম তপস্যার অংশ। তপস্যা হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সযত্ন প্রচেষ্টা চালানো। যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ধর্মের চারটি ভিত্তি। এগুলো হচ্ছে : তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য। তপস্যাই মূল ধর্ম। অপর তিনটি তপস্যার অংশ বলে বিবেচিত। তপস্যার আবার প্রকারভেদ আছে। যেমন— শারীরিক তপস্যা, বাচিক তপস্যা, মানসিক তপস্যা ইত্যদি।

শীত, উষ্ণতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সহ্য করা, দেবতাদের পূজা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি শারীরিক তপস্যা।

সত্য, প্রিয়, হিতকর বাক্যের প্রয়োগ ও শাস্ত্র পাঠকে বাচিক তপস্যা বলে। আর চিন্তের প্রসন্নতা অনিষ্টকরতা বাকসংযম ও আত্মসংযম (নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা), ছলচাতুরী না করা ইত্যাদি হচ্ছে মানসিক তপস্যা। সুভারো দেখা যাচ্ছে, সংযম তপস্যার অংশ এবং ধর্মের অঙ্গ।

সংযম ছাড়ান জীবনে হালহীন নৌকা বা বজ্রহীন যোদ্ধার মতো। কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তার ফলে জীবনে আসে উজ্জ্বলতা। সংযম আমাদের চরিত্রকে শৃঙ্খলমণ্ডিত ও মহৎ করে। সুতরাং সংযমসাধনা সিদ্ধিলাভের অন্যতম প্রধান উপায়।

সংযম ত্রুষ্ণচর্যের অংশ। সংযমের মধ্য দিয়ে পুরুষে শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করার সময়কালকে শাস্ত্রে ত্রুষ্ণচর্য বলা হয়েছে। সুতরাং সংযম হচ্ছে ছাত্রজীবনের অঙ্গ।

সংযম না থাকলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক যে-কোন কাজ পত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তো বলা হয়, সংযম হারিয়ে 'রেগে গেলেম তো হেরে গেলেম'।

সংযমকে সারা জীবনের সঙ্গী করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংযম বজায় রাখতে হবে। কৃষি বশিষ্ঠ সর্বাধিকার সংযম বজায় প্রবেশ করেন বলেই তিনি সর্বজনপূজন মহর্ষিরূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

পঞ্চাশতের কৃষি দুর্বলা মাঝেমাঝেই সংযম হারাতেন। তার জন্য তিনি কষ্ট ভোগ করেছেন এবং অপায়ে কলঙ্কিত হয়েছেন।

সুতরাং সংযম জীবনের সহায়ক। পরমতসহিষ্ণু হতে হলেও সংযমের অগ্রাস্য করতে হবে।

সংযম ও পরমতসহিষ্ণুতা ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

একক কাজ : জীবনে সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাঁচটি বাস্তব লেখ।

নতুন শব্দ : দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, শৌচ, বাচিক, হিতকর, প্রসন্নতা, বাকসংযম, ছলচাতুরী, হালহীন, বজ্রহীন, সিদ্ধিলাভ।

পাঠ ৮ : অহিংসা

জীবকে গীড়ন ও হত্যা না করাকে বলা হয় অহিংসা। যোগশাস্ত্রে যম (সংযম), নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি নামে যোগের অষ্টটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যম বা সংযম অহিংসার ভিত্তি।

সহিংসতা অহিংসার বিপরীত। জীবকে গীড়ন বা হত্যা করার প্রবৃত্তিকে বলে সহিংসতা।

আমরা বিদ্ভ, ব্যাভি, প্রতিক্রিষ্টি, যশ ইত্যাদি শোভে চাই। আর এগুলো পাওয়ার পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাদের প্রতি সহিংস আচরণ করি। এ-আচরণ অসংযমিক।

সহিংসতা সমাজে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে কষ্ট দেয়। অনেক সময় সহিংসতা প্রাণহরণের কারণ হয়। সুতরাং সহিংসতা অসংযম।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, যিনি নিষ্ঠুর আচরণ করেন না, কাউকে হিংসা করেন না, তিনি স্বর্গলোক জয় করতে পারেন (৪/২৪৬)। মনুসংহিতা থেকে অহিংসা সম্পর্কে আরও জানতে পারি যে, যিনি অহিংস, তিনি ধর্মকৃত্যসহ সকল সংকারে সাফল্য লাভ করেন। (৫/৪৫)।

শুধু মনু সংহিতাতেই নয়, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে অহিংসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অহিংসা যম (সংযম) নামক যোগের অংশ হিসেবে সাধনা বা তপস্যার সহায়ক, ইহলোকের অবলম্বন এবং পরলোকে মোক্ষলাভের অন্যতম প্রধান উপায়। তাই তো বলা হয় 'অহিংসা পরম ধর্ম'।

মহাত্মার্তে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে তীর্থ বলেছেন, সকল জীবের অহিংসা পরম ধর্ম বলে জানবে।

হিংসার পরিণাম শূন্য হয় না। কৌরবেরা পাণ্ডবদের হিংসা করতেন। তাঁদের পরিণাম শূন্য হয়নি।

তবে অহিংসা বলতে কিন্তু কাপুরুষতা বা তীব্রতাকে বোঝায় না। নির্বিচারে ক্ষমাও বোঝায় না। ন্যায়বিচার করে অপরাধীর শাস্তি দান হিংসা বলে গণ্য হবে না।

নিজের স্বার্থে পরপীড়ন, পারের ক্ষতি করার চেষ্টা বা কাটিকে হত্যা করাকেই সহিংসতা বলা হয়েছে। সুতরাং পরপীড়ন না করাই অহিংসা। অহিংসা ব্যক্তিকে মহান করে, সমাজে শান্তি আসে। অহিংসা ধর্মের অঙ্গ এবং একটি অনুসরণীয় নৈতিক মূল্যবোধ।

নতুন শব্দ : যোগশাস্ত্র, প্রবৃত্তি, ইহলোক, পরলোক, মোক্ষপাথ, কৌরব, পাণ্ডব।

পাঠ ৯ : পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার, সংসজ্ঞা, সংযম ও অহিংসা— এ-মূল্যবোধগুলো গঠনের উপায়।

ন্যায়বিচার

বিষ্মতত্ত্ব গ্রন্থের আদর্শ অনুসরণ করে আমরা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার নামক মূল্যবোধ গঠন করতে পারি। মহাভারতে আছে, অযোধ্যার রাজা সভাকামের পিতা রাজা দ্রুমত্বক্সন মুদ্রাদেয়ের যোগ্য কতকজন অপর্যবেক্ষিত সভাকামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সভাকাম তখন বলেছিলেন, অপরাধীর কার্য নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিচার না করে মুক্তদত্ত দেওয়া অদায়। সভাকামের কথা মতো ন্যায়বিচারের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা যদি ন্যায়বিচারের আদর্শ গ্রহণ করি, তাহলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ গঠিত হবে।

সংসজ্ঞা

সংসজ্ঞার আদর্শও আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে পাই। অসংসজ্ঞা পরিত্যাগ করে আমরা যদি সংসজ্ঞা করি, তাহলে সংসজ্ঞার মূল্যবোধ গঠিত হবে। সংসজ্ঞা কেবল পুণ্ডিত বিদ্যার বিষয় নয়, তা আচরণীয় বিষয়। জীবনে প্রয়োগ করার বিষয়।

সংযম

সংযম অসীমতা যোগের অন্যতম। পরিবার ও সমাজের সকল সদস্য যদি প্রতিনিয়ত সংযত আচরণ করে, তাহলে পরিবার ও সমাজজীবনে সংযম নামক মূল্যবোধটি গঠিত হবে। আর এ সংযত মানুষদের আচরণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচরণেও প্রতিফলিত হবে। সুতরাং সংযত আচরণের অনুশীলনই সংযম নামক মূল্যবোধটি গঠনের উপায়।

অহিংসা

অহিংসা হম বা সংযম নামক অসীমতা যোগের অঙ্গ। অহিংসা ছাড়া ধর্মচরণ সম্ভব নয়। অহিংসাও অনুশীলনসাপ্য। কোনো অবস্থাতেই আমরা জীবকে হিংসা করব না। জীবকে শ্রদ্ধা জান করব। তাহলে আর মনে হিংসার জন্ম হবে না। শ্রীমদভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসরণ করে ক্রোধ ও ঈর্ষাকে দূরে রাখব। মনের মধ্যে সর্বদা থাকবে সন্তোষ। সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করব। প্রাণিতে অহংকারী হব না, অশ্রদ্ধিতেও ভেঙে পড়ব না। এভাবে জীবনযাপন করলে অহিংসা হবই।

মেটিকথা, উপলব্ধি ও অনুশীলনই যে-কোনো প্রকার মূল্যবোধ গঠনের প্রকৃষ্ট উপায়। একথা মনে রেখে ব্যস্ত ব জীবনে ভিন্ন প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট থাকব।

নতুন শব্দ : অষ্টাঙ্গা, অনুশীলনসাধা, ঈর্ষা, অশ্রাণি।

পাঠ ১০ : এইচআইভি/এইডস ও তার প্রতিকার

এইডস ও এইচআইভির ধারণা

নৈতিকতার বিপরীত প্রবৃত্তি হচ্ছে অমৈতিকতা। মানুষ যেমন ভালো কাজ করে, তেমনি মন্দ কাজেও লিপ্ত হয়। সাদর বিপরীতে যেমন ভালো থাকে, তেমনি আলোর বিপরীতে থাকে অন্ধকার। আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি অমৈতিক কাজ সম্পর্কেও ধারণা অর্জন করতে হয়। অমৈতিক কাজকে চিনে রাখলে আমরা তা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক থাকতে পারব। আমরা যষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ধূমপান ও মাদকাসক্তির মতো অমৈতিক কাজ সম্পর্কে জানেছি।

এ-শ্রেণিতে আমরা এখন এমন একটি রোগ সম্পর্কে জানব, যার উৎস একটি অমৈতিক কাজ। রোগটির নাম এইডস।

এইডস একটি মারাত্মক রোগ। এইডস-এ অক্রান্ত হলে রোগীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে কমে যায়। তার ফলে সে নানাপ্রকার রোগে ঘনঘন অক্রান্ত হতে থাকে। এ-রোগ এখন পর্যন্ত নিরাময়যোগ্য নয়। শেষ পর্যন্ত রোগীর অকালমৃত্যু ঘটে।

এইডস কথাটি ইংরেজি AIDS-এর পূর্ণরূপ হলো :

A = Acquired

I = Immune

D = Deficiency

S = Syndrome

Acquired Immune Deficiency Syndrome সংক্ষেপে AIDS (এইডস)।

এইডস রোগ হয় একপ্রকার অতি ক্ষত্রকৃতির জীবাণু থেকে। যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন একপ্রকার ভাইরাস। এ ভাইরাসটির নাম হচ্ছে এইচআইভি। এইচআইভি ইংরেজি HIV-এর পূর্ণরূপ : Human Immune Deficiency Virus.

এইডস-এর কারণ

ক. শরীরে এইচআইভি ভাইরাস আছে, এমন কারও রক্ত যদি অন্যের শরীরে সঞ্চারিত করা হয়, তাহলে রক্ত গ্রহণকারী ব্যক্তির এইডসে অক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। একজনের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ বা সুই যদি অন্যজন ব্যবহার করে তাহলে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। যারা ইন্জেকশনের মাধ্যমে মেশা করে, তারা এভাবে এইডস-এ অক্রান্ত হতে পারে। যেহেতু রক্তের মধ্য দিয়ে এইচআইভি সংক্রামিত হয়, সুতরাং ব্যবহৃত ব্রেক, ফ্লুর, ঢাক ইত্যাদির মাধ্যমেও এ-জীবাণু ছড়তে পারে।

ব. এইডস-এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যৌনমিলন। কেউ যদি এইচআইভি ভাইরাস বহন করছে, এমন কারণে সন্তান যৌনভাবে মিলিত হয়, তাহলে তার এইডস-এ অক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গ. গর্ভকালীন সময়ে বা গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে এবং জন্মের পরে বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর স্তনীরে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

তবে এইডস ছোঁয়াচে প্রাণ নয়। এইসড-এ অক্রান্ত প্রাণীর সঙ্গে দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম করলে এইডস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এইডস-এ অক্রান্ত প্রাণীর সঙ্গে কোলকুলি করলে, একই টয়লেট ব্যবহার করলে, তার কফ বা সর্নি থেকে কিংবা তার চোখের জল বা ঘাম থেকে এইচআইভি সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এইচআইভি সংক্রমণ হয় রক্ত, যৌনমিলন এবং অক্রান্ত মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে।

এইচআইভি/এইডস-এর প্রভাব

১. স্বাস্থ্যসেবার ওপর প্রভাব

- এইচআইভি/এইডস জনস্বাস্থ্যগত মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে।
- স্বাস্থ্যব্যয়ে বরাদ্দের একটা বড় অংশ অক্রান্তদের পেছনে ব্যয় করতে হয়।
- একজন এইচআইভি পীড়িত বহনকারীর খরচা বাহিত হয়ে এইডস রোগ অন্যদের সংক্রমিত করতে পারে।

২. অর্থনৈতিক প্রভাব

- উৎপাদন খাত ক্রটিগ্রস্ত হয়।
- পর্যটন খাত ক্রটিগ্রস্ত হয়।

৩. সামাজিক প্রভাব

- অনাথ বা এতিম ও বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- সামাজিক ও পরিবারিক বন্ধন শিথিল হয়।
- এইডস-এ অক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজের অধিকাংশ লোক ঘৃণার চোখে দেখে। অক্রান্ত ব্যক্তি ও লাঞ্ছনা মরমে মরে থাকে।
- জীবনে বঞ্চনা, হতাশা, অবিশ্বাস, ভয় ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের উপায়

সেসব কারণে এইচআইভি সংক্রমিত হয়ে এইডস রোগের সৃষ্টি করে, সেগুলো পরিহার করতে হবে, যেমন—

১. রক্ত পরীক্ষা করার সময় দেখতে হবে, রক্তদাতা এইচআইভি বহন করছে কি না। এইচআইভি-আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করা যাবে না।

২. ধর্মীয় অনুশাসন যেনে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়া যাবে না।
৩. বিবাহিত জীবনে স্বামী/স্ত্রীর মধ্যেই যৌনমিলন ঘটবে। অবৈধ যৌনমিলন থেকে চিরতরে বিরত থাকতে হবে।

হিন্দুধর্ম ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান রয়েছে। মনুষ্যবিত্যার পরদারগমন নামক পাপকে পঞ্চমহাপাপের অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ-ধর্মে মাদকাসক্তিকে কেবল বর্জন করতেই বলেনি, মাদকাসক্তের সংসর্গে যাওয়া বা থাকাকেও মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়েছে।

সুতরাং হিন্দুধর্মের বিধিবিধান তথা অনুশাসন যথাযথভাবে যেনে চললে শুধু এইডসই না, যে-কোনো রকম যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

আমাদের সেই তো আত্মকূপে নিরাজমান ঈশ্বরের মন্দির। আমরা বাইরের মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখি। তাহলে সেহমন্দিরকে পবিত্র রাখব না কেন? আর সেহমন্দিরকে পবিত্র রাখলেই এইচআইভি/এইডস থেকে মুক্ত থাকতে পারব।

এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর প্রতি আচরণ

হিন্দুধর্ম বলে, ‘পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।’ তাই আমরা এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে স্নেহমতাময় আচরণ করব। একজন আত্মবিক মানুষ থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখব না। তাঁর মানবিক মর্যাদাকে খাটো করে দেখব না। কারণ আমরা জানি, এইডস সাংক্রমিক রোগ নয়। তাই এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমরা এমন তাবে একজন এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে ব্যানহাস করব, যাতে তাঁর আত্মবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়। তিনি যেন আত্মবিকভাবে সকল কাজ করতে পারেন। তাঁর মন যেন প্রশান্ত থাকে। হিন্দুধর্ম জীবকে প্রযাজ্যানে সেবা করতে বলেছে। এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও যেন সে-সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়।

দৈনিক কাজ : এইডস রোগীদের প্রতি করণীয় দিকগুলো লিখে পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নিরাময়যোগ্য, বিকির, ব্রোত, স্ক্র, যৌনমিলন, গর্ভকালীন, প্রসবকালে, হেঁসাতে, পরদারগমন, গর্ভাশ্রয়, সেহমন্দির।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আমাদের সর্বনা কথা বলা উচিত।
২. মূল্য কমাতি ঘরা মান বা বোঝায়।
৩. নৈতিক মূল্যবোধ অঙ্গ।
৪. প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
৫. সদ্যসজ্জা হচ্ছে সান্নিধ্য।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পরশপাখর	ঈশ্বরকে সেবা করা হয়
২. জীবসেবা করলে	দান করেন
৩. সাধু প্রতিদিন ভোরে	মহৎ গুণ
৪. পরমহংসহিষ্ণুতা	হিংসার বিপরীত দিক লোহকে অর্পণে পরিণত করে

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. সমসত্ত্ব বলতে কী বোঝায় ?
২. অহিংসাকে পরম ধর্ম বলার কারণ দু'খিয়ে লেখ
৩. মানবজীবনে সংযমের প্রয়োজনীয়তা দু'খিয়ে লেখ।
৪. মৈত্রেয় মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বর্তমান সমাজে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
২. 'সংসজ্ঞার মাধ্যমে জীবনের চরম শিখরে আরোহণ করা সম্ভব'— শ্রীধরের জীবনাবশুনে ব্যাখ্যা কর।
৩. 'এইডস' প্রতিরোধের জন্য চাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা— মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. যোগশাস্ত্রে যোগের কয়টি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে ?
ক. চারটি
খ. ছয়টি
গ. আটটি
ঘ. দশটি
২. 'এইডস' প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন -
i. ধর্মীয় অনুশাসন
ii. ব্যক্তিগতচেতনতা
iii. সহনশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রবিন দেখল কয়েকটি ছেলে কৌতূহলবশত একটি বিভাগকে আঘাত করেছে। বিভাগটির খুবই খারাপ অবস্থা। সে ছেলেগুলোকে তড়িয়ে দিল এবং বিভাগটিকে বাড়িতে নিয়ে সেবা করতে লাগল।

৩. রবিনের মধ্যে কাজ করেছে—

- i. অহিংসা
- ii. ন্যায়-বিচার
- iii. সংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উক্ত কাজের মাধ্যমে রবিনের পক্ষে সম্ভব—

- i. পুণ্যার্জন
- ii. ভালোবাসা লাভ
- iii. স্বর্ণলাভ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

দিনেশবাবু এলাকায় ধর্মী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলে ঢাকায় একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে, আর ছোট ছেলে বাড়িতেই তাঁর সাথে সংসারের কাজকর্ম তদারকি করে। বড় ছেলে অফিসের কাজের খামেলায় সহজে বাড়ি ছেতে পারে না, আর সেটাই দিনেশবাবুর খোঁজ। তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, এই সময় তিনি তাঁর সম্পদের চার ভাগের তিন ভাগ ছোট ছেলের নামে লিখে দেন।

ক. প্রহাদের পুত্রের নাম কী ?

খ. সংস্কারকে অভ্যস্ত মনুর বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. দিনেশবাবুর অচরণের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের কোন দিকটির বৈমুখ্য লক্ষ করা যায় ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দিনেশবাবুর কাজটি তোমার পঠিত 'প্রহাদের ন্যায়বিচার' উপাখ্যানের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৮-হিন্দুধর্ম

মন যার সংশয়ী তার বড় কষ্ট
-শ্রী সারদা দেবী

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

দ্রষ্টব্য :